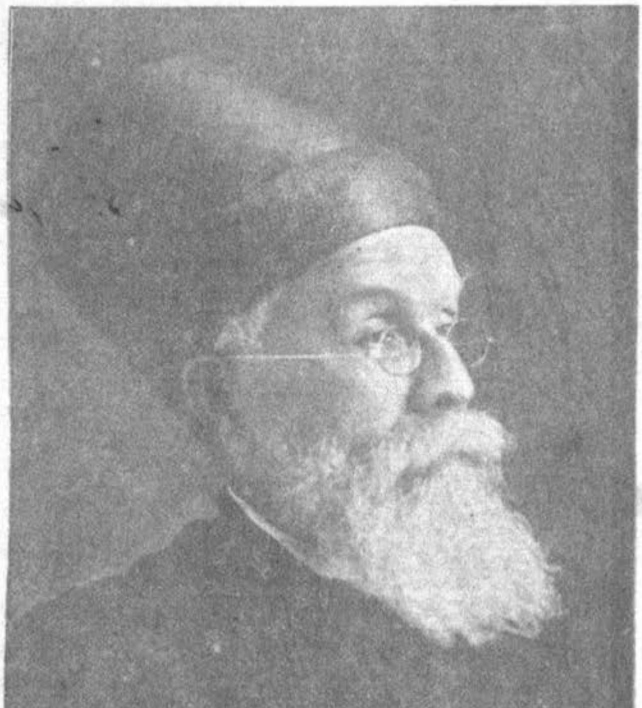

দাদাভাই নৌরোজী।

১২৯

ভারত-মহিলা

> The woman's cause is man's; they rise or sink
> Together, dwarfed or God-like, bond or free;
> If she be small, slight-natured, miserable,
> How shall men grow?
>
> *Tennyson.*

Bre. 647
/5
BENGAL LIBRARY
14 FEB. 1907
WRITERS' BUILDINGS
Rg. 369
14-1-1907

২য় ভাগ। } পৌষ, ১৩১৩। ৫ম সংখ্যা।

ঋগ্বেদের দেবতাগণ।

চতুর্থ প্রস্তাব।

ইন্দ্রের বীরত্ব।

ইন্দ্র সোমপানে আহ্লাদিত এবং উৎসাহিত হইয়া বৃত্রাদি শত্রুবধার্থ গমন করেন। পৌরাণিক সাহিত্যে ইন্দ্রের বৃত্রসংহার অতি প্রসিদ্ধ। দেবগণ দুর্দ্দান্ত বৃত্রাসুর কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়া ব্রহ্মার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মার অনুজ্ঞানুসারে তাঁহারা সরস্বতী নদীর পর পারে দধীচ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার চরণ গ্রহণ পূর্ব্বক অভিবাদন করতঃ ব্রহ্মানির্দ্দিষ্ট বর প্রার্থনা করিলেন। দধীচ প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন এবং সুরগণ তাঁহার অস্থি সকল গ্রহণ করিয়া বিশ্বকর্ম্মা ত্বষ্টার নিকট গমন করিলেন। ত্বষ্টা এই অস্থি দ্বারা এক ভীষণদর্শন বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া পুরন্দরকে কহিলেন, হে দেবরাজ ইন্দ্র, আপনি এই বজ্র দ্বারা যুদ্ধ-দুর্ম্মদ সুরারি অসুরগণকে নিধন করিয়া স্বর্গরাজ্য নির্ব্বিবাদে শাসন করুন।

ইন্দ্র দেবগণসমভিব্যাহারে দানবগণের সহিত তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ঃ—

> ততো যুদ্ধং সমভবদ্দেবানাং দানবৈঃ সহ।
> মুহূর্ত্তং ভরতশ্রেষ্ঠ লোকত্রাসকরং মহৎ ॥ ৩
> উদ্যত প্রতিপিষ্টানাং খড়্গানাং বীরবাহুভিঃ।
> আসীৎ সুতুমুলঃ শব্দঃ শরীরেষভিপাত্যতাম্ ॥ ৪
> শিরোভিঃ প্রপতদ্ভিশ্চাপ্যন্তরীক্ষান্মহীতলম্।
> তালৈরিব মহারাজ বৃন্তাদ্ভ্রষ্টৈরদৃশ্যত ॥ ৫
> তে হেমকবচা ভূত্বা কালেয়াঃ পরিঘায়ুধাঃ।
> ত্রিদশানভ্যবর্ত্তন্ত দাবদগ্ধা ইবাদ্রয়ঃ ॥ ৬
> তেষাং বেগবতাং বেগং সাভিমানং প্রধাবতাম্।
> ন শেকুস্ত্রিদশাঃ সোঢ়ুং তে ভগ্না প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ ॥ ৭
> তান্ দৃষ্ট্বা দ্রবতো ভীতান্ সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ।
> বৃত্রে বিবর্দ্ধমানে চ কশ্মলং মহদাবিশৎ ॥ ৮
> কালেয়ভয়সন্ত্রস্তো দেবঃ সাক্ষাৎ পুরন্দরঃ।
> জগাম শরণং শীঘ্রং তং তু নারায়ণং প্রভুম্ ॥ ৯
>
> বনপর্ব্ব ১০১। ৩—৯

অনন্তর দানবগণের সহিত দেবগণের ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বীরগণ খড়্গোত্তোলন করিয়া আঘাত করিবামাত্র সেই খড়্গ বিপক্ষশরীরে নিপতিত হইয়া ভীষণ শব্দ উৎপাদন করিল এবং বীরগণের সমস্ত মস্তক বৃন্তশ্লথ তাল ফলের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল।

এইরূপ তুমুল সংগ্রাম সময়ে কালেয় দানবগণ হেমকবচ পরিধান পূর্ব্বক পরিঘ অস্ত্রগ্রহণ করিয়া দাবদগ্ধ পর্ব্বতরাজির ন্যায় দেবগণকে আক্রমণ করিল। বেগবান

অস্থরেরা সাতিশয় দর্পভরে ধাবমান হইলে দেবগণ তাঁহাদিগের বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন। সহস্রলোচন দেবগণকে ভয়ে পলায়ন করিতে ও বৃত্রাস্থরকে বিবর্দ্ধমান হইতে অবলোকন করিয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র স্থরারি-ভয়ে ভীত হইয়া নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন।

স্থররাজ ইন্দ্র বিষ্ণুকর্ত্তৃক উৎসাহিত হইলেন এবং দেবগণ স্বীয় তেজ ধারণ করিলেন। বিষ্ণুর সহিত মিলিত হইয়া দেবগণ পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। পুনরায় ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল :—

জ্ঞাত্বা বলস্থং ত্রিদশাধিপ[illegible] বৃত্রো মহৌজো নিনাদান্।
তস্য প্রণাদেন ধরা দিশ[illegible]ন গাশ্চাপি চচাল সর্ব্বম্॥
ততো মহেন্দ্রঃ পরমাভিতপ্ত[illegible] শ্রুত্বা রবং ঘোররূপং মহান্তম্।
ভয়ে নিমগ্নস্ত্বরিতো মুমোচ বজ্রং মহৎ তস্য বধায় রাজন্॥
স শক্রবজ্রাভিহতঃ পপাত মহাস্থরঃ কাঞ্চনমাল্যধারী।
যথা মহাশৈলবরঃ পুরস্তাৎ স মন্দরো বিষ্ণুকরাদ্বিমুক্তঃ॥
তস্মিন্ হতে দৈত্যবরে ভয়ার্ত্তঃ শক্রঃ প্রদুদ্রাব সরঃ প্রবেষ্টুম্।
বজ্রং স মেনে ন করাদ্বিমুক্তং বৃত্রং ভয়াচ্চাপি হতং ন মেনে॥
সর্ব্বে চ দেবা মুদিতাঃ প্রহৃষ্টাঃ মহর্ষয়শ্চেন্দ্রমভিষ্টুবন্তঃ।
সর্ব্বাংশ্চ দৈত্যাংস্ত্বরিতাঃ সমেত্য জঘ্নুঃ স্থরা বৃত্রবধাভিতপ্তান্॥
বনপর্ব্ব ১০১। ১৩—১৭

বৃত্রাস্থর স্থরপতিকে এইরূপ অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে অতিভীষণ নিনাদ পরিত্যাগ করিলে মহীতল, দিক্ সকল, অন্তরীক্ষ ও দেবলোক কম্পমান হইতে লাগিল। দেবরাজ তাহার ভীষণ নিনাদ শ্রবণে সমভিতপ্ত ও ভয়ে অভিভূত হইয়া তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত সত্বর কুলিশ পরিত্যাগ করিলেন। কাঞ্চনমাল্যধারী মহাস্থর বৃত্র ইন্দ্রের কুলিশপাতাভিহত হইয়া বিষ্ণুকর-মুক্ত মহাগিরি মন্দরের ন্যায় নিপতিত হইল। স্থররাজ ইন্দ্র বৃত্রভয়ে এরূপ ভীত হইয়াছিলেন যে, তিনি স্বয়ং বজ্রাঘাত করিয়া তাহার প্রাণসংহার করিয়াছেন, ইহা একবারে বোধ করিতে অসমর্থ হইয়া সরোবরে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করিবার নিমিত্ত পলায়ন করিলেন। তখন দেবগণ বৃত্রাস্থরকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দ-ভরে দেবরাজকে স্তব ও বৃত্রব্যাধ-ব্যাকুল অবশিষ্ট দৈত্যকুলকে নির্ম্মূল করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঋগ্‌বেদে আমরা দেখিতে পাই, যে ইন্দ্র তাঁহার বিশ্বস্ত সখা (ইন্দ্রস্য যুজ্যসখা) বিষ্ণু এবং মরুদ্‌গণের সহিত বৃত্রসংহারার্থ যান। বৃত্র এবং অন্যান্য অস্থরগণ মেঘস্থ জল ভূতলে পতিত হইতে দেয় না। তজ্জন্য বৃত্র সকলের শত্রু। ইন্দ্র অস্থরদমনকারী রূপে প্রসিদ্ধ:—

বীরং দানৌকসং বন্দধ্যৈ পুরাং গূর্ত্তশ্রবসং দর্ম্মাণং। ১।৬১।৮

তৎপরে বীর, অস্থরদিগের পুরবিদারক এবং প্রশংস-নীয়ান্নবিশিষ্ট ইন্দ্রকে আমি স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হই।

বৃত্র (বেষ্টনকারী), অহি, শুষ্ণ, নমুচি, পিপ্রু, শম্বর প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত অস্থরগণের জেতারূপে ইন্দ্র ঋগ্‌বেদের বহু সূক্তে স্তুত হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, যে বৃত্র বৈদিক ঋষিদের কল্পনা-প্রসূত। সকলেই জানেন, প্রখর গ্রীষ্মের সময়ে যখন আকাশে মেঘ দেখা দেয় তখন কেমন আগ্রহের সহিত আমরা বৃষ্টির প্রতীক্ষায় থাকি। কিন্তু বৃষ্টি প্রায়ই আসে না। কোন কোন সময়ে ধূলিঝড় হইয়াই মেঘ অন্তর্হিত হয়। এইরূপ স্থলে প্রাচীন ঋষিগণ মনে করিতেন, যে কোন দৈত্য অসূয়াপরবশ হইয়া মেঘোদককে অধঃপতিত হইতে দিতেছে না। স্থপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিত John Muir এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সকলেই প্রাকৃতিক দৃশ্য দ্বারা অনেক বৈদিক আখ্যানের অর্থ বুঝাইতে চেষ্টা করেন। বৃষ্ট্যুদক অস্থরদিগের ধন। ইন্দ্র তাহা অপহরণ করেন :—

মুষায়দ্বিষ্ণুঃ পচতং সহীয়ান্ বিধ্যদ্বরাহং তিরো অদ্রিমস্তা। ১।৬১।৭

জগদ্ব্যাপক, শত্রুদিগের পরাভবকর্ত্তা, বজ্রক্ষেপক ইন্দ্র অস্থরদিগের পরিপক্ক ধন অপহরণ পূর্ব্বক তির্য্যক্‌ভাবে মেঘকে তাড়না করিয়াছিলেন।

বৃত্রবধার্থ দেবপত্নীরা ইন্দ্রকে স্তুতি করিতেন :—

অস্মা ইদু গ্নাশ্চিদ্দেব পত্নীরিন্দ্রায়ার্কমহিহত্য উবুঃ।

বৃত্রবধের নিমিত্ত গমনশীলা ও স্থিতিশীলা দেবপত্নীরা ইন্দ্রকে স্তুতি করিয়াছিলেন।

অস্যেদেব শবসা শুষন্তং বি বৃশ্চদ্বজ্রেণ বৃত্রমিন্দ্রঃ।
গা ন ব্রাণা অবনীরমুঞ্চদভি শ্রবো দাবনে সচেতাঃ॥ ১।৬১।১০

স্ববলের সহিত শোষক বৃত্রাসুরকে ইন্দ্র বজ্র দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিলেন। আর যজ্ঞকারী উপাসকের নিমিত্ত, চৌরাপহৃত গো সমূহের ন্যায় বৃত্রাসুর কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ জলসমূহ, কর্ম্মফলভূত অন্ন উদ্দেশ করিয়া তিনি মুক্ত করিয়াছিলেন অর্থাৎ বর্ষণ করিয়াছিলেন।

বৃত্র অন্তরীক্ষে জল রুদ্ধ করিয়া রাখিত এবং ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন, একথা ঋগ্‌বেদে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত আছে :—

অভি স্বমৃষ্টিংমদে অস্য যুধ্যতো রঘ্বীরিব প্রবণে সস্রুরূতয়ঃ।
ইন্দ্রো যদ্বজ্রী ধৃষমাণো অন্ধসা ভিনদ্বলস্য পরিধীরিব ত্রিতঃ।
পরীং ঘৃণা চরতি তিত্বিষে শবোঽপো বৃত্বী রজসো বুধ্নমাশয়ৎ।
বৃত্রস্য যৎ প্রবণে দুর্গৃভিশ্বনো নিজঘন্থ হন্বোরিন্দ্র তন্যতুঃ ১।৫২।৫—৬

মরুদ্দেবগণ সোমপান করিয়া বৃত্রসহ যুধ্যমান ইন্দ্রের পুরোবর্ত্তী হইয়া নিম্নদেশগামী জলের ন্যায় বৃত্রাসুরের অভিমুখে গমন করিয়াছিলেন; ত্রিনামক পুরুষ যেমন কূপাচ্ছাদক পরিধিকে নষ্ট করিয়াছিলেন, তৎকালে বজ্রধারী ইন্দ্র সোমপান দ্বারা উৎসাহযুক্ত হইয়া সেই প্রকার বলনামক অসুরকে ধ্বংস করিয়াছিলেন; যে বৃত্রাসুর উদক অবরোধ করিয়া জলের তলভাগ আশ্রয় পূর্ব্বক শায়িত ছিল, এবং জলমধ্যস্থিত যে বৃত্রাসুরের শরীর কেহ আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় নাই, হে ইন্দ্র, আপনি যৎকালে প্রহারক বজ্র দ্বারা সেই বৃত্রাসুরের মুখের উভয় পার্শ্বে প্রহার করিয়াছিলেন, তখন শত্রুজয়-প্রকাশিকা দীপ্তি আপনাকে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপিয়াছিল এবং আপনার বলও প্রদীপ্ত হইয়াছিল।

কোথাও এইরূপ যুদ্ধের বর্ণনা আছে। বার্দ্ধক্যবশতঃ সমস্ত দেবগণ যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু ইন্দ্র পরাক্রান্ত; তাঁহাকে সমস্ত ক্ষমতা দিয়া যুদ্ধে পাঠান হইল। সাধারণতঃ মরুদ্‌গণ ইন্দ্রের সঙ্গে থাকিতেন, কিন্তু এইবার তাঁহারাও যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে সাহস করিলেন না। দানব ইন্দ্রের গণ্ডদেশে আঘাত করিল; সুররাজ আহত হইয়াও যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে বৃত্রকে পরাস্ত করিলেন। ইন্দ্র যখন ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, তখন দুর্দ্দান্ত দানব ইন্দ্রের দুর্জ্জয় শক্তি অনুভব করিতে পারিল। তীক্ষ্ণ ছুরিকার ন্যায় ইন্দ্র তাঁহার বজ্র প্রস্তরে শাণিত করিলেন। বজ্রাঘাতে যেমন প্রকাণ্ড বৃক্ষের পতন হয়, বৃত্র তদ্রূপ ইন্দ্রের প্রহারে পরাস্ত হইল। প্রবল স্রোত বৃত্রের মস্তক সুদূরে লইয়া গেল। দেব ও দেবীগণ বিজয়োৎসব করিতে লাগিলেন এবং পৃথিবীতে মর্ত্ত্যগণ ইন্দ্রের প্রশংসা গাহিলেন এবং তাঁহার আনন্দবর্দ্ধনার্থ সোমরস দিলেন।

অন্যত্র এই রূপ লিখিত আছে, যে পণিগণ গাভী (অর্থাৎ মেঘ) হরণ করিয়া এক পর্ব্বতগুহায় লুক্কায়িত রাখিয়াছিল। সরমা ইন্দ্রের দূতী স্বরূপ প্রেরিত হইয়া গোধন আনিতে গেল। পণিগণ বিদ্রূপচ্ছলে সরমাকে কহিল :—

কীদৃঙিন্দ্রঃ সরমে কা দৃশীকা যস্যেদং দূতীরসরঃ পরাকাৎ।
আ চ গচ্ছান্মিত্রমেনা দধামাথা গবাং গোপতির্নো ভবাতি ॥১০।১০৮।৩

হে সরমে! যে ইন্দ্রের দূতী হইয়া তুমি দূর দেশ হইতে আসিয়াছ, সেই ইন্দ্র কিরূপ পরাক্রমবান্? তিনি দেখিতে কি প্রকার? তিনি আসুন, তাঁহাকে আমরা বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি, তিনি আমাদিগের গাভী লইয়া সেই গাভীগণের স্বত্বাধিকারী হউন।

সরমা ভয়-প্রদর্শনার্থ বলিল :—যে ইন্দ্রের দূতী হইয়া আমি দূর দেশ হইতে আসিয়াছি, তাঁহাকে তোমরা পরাজয় করিতে পারিবে না; তিনি সকলকে জয় করেন। গভীর নদীসকল তাঁহার গতিরোধ করিতে পারে না। হে পণিগণ! তোমরা শীঘ্রই ইন্দ্রদ্বারা বিনষ্ট হইবে।

পণিগণ কিছুতেই ভীত হইল না। শক্তিশালী ইন্দ্র আসিয়া পর্ব্বতগহ্বর হইতে গাভী সকল বাহির করিলেন এবং গৃহে লইয়া গেলেন। অতএব দেখা যাইতেছে, যে ইন্দ্র প্রাচীন আর্য্যদের যুদ্ধদেবতা ছিলেন। আর্য্যগণ তখন তাঁহাদের নূতন উপনিবেশ উত্তর ভারতে আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে অবিরত যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন। অতএব বিজয়ী বীর ইন্দ্র তাঁহাদের আদর্শ স্বরূপ ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে অনেকে মনে করেন যে, কেবল ইয়ুরোপীয়গণই অত্যন্ত নিষ্ঠুর, কেননা তাঁহারা আফ্রিকা এবং অন্যান্য

অসভ্য দেশে গিয়া আদিম অধিবাসীদিগকে তাড়াইয়া দিয়া, অথবা বধ করিয়া আপনারা তাঁহাদের দেশে বাস ও আধিপত্য করেন। কিন্তু বৈদিক সময়ে আর্য্যগণও বিজিত অসভ্যদিগের প্রতি ঠিক এইরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, ঋগ্বেদে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

যে যুদ্ধের সময় ইন্দ্রে বিশ্বাস করে সে জয়ী হয়। কেননা ইন্দ্র শক্তিশালী; তিনি শম্বর অসুরের নিরনব্বই সংখ্যক নগর নষ্ট করিয়াছিলেন (ত্বং পুরো নবতিং দম্ভয়ো নব, ১।৫৪।৬।) কৃষ্ণবর্ণ অসভ্যদের পঞ্চাশ সহস্রকে তিনি একবারে পরাজয় করিতে পারেন এবং তাহাদের দুর্গ অনায়াসে বিনষ্ট করিতে পারেন। মনোহর সঙ্গীত, যজ্ঞ এবং প্রচুর সোমরস দ্বারা লোকে শক্তিপুত্র ইন্দ্রকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে। যে তাঁহাকে সোমরস দেয় না, এবং যে কৃপণ তাঁহাকে কোন উপহার দেয় না, তিনি তাহার বন্ধু নহেন। কিন্তু তাঁহার উপাসকের গোধন কখন নষ্ট হয় না; যে বীর তাঁহার জন্য যজ্ঞ করেন তিনি নিরাপদে থাকেন, এবং তাঁহার প্রশংসাকারী প্রচুর ধন প্রাপ্ত হয়। অতএব আর্য্যগণ তাঁহার বন্ধুত্বলাভের জন্য বড়ই ব্যগ্র ছিলেন। ইন্দ্রই আর্য্যদিগের জন্য ভারত জয় করিয়াছিলেন। শুধু যে তিনি সমস্ত আর্য্যজাতিকে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা নয়, ব্যক্তিবিশেষের প্রতি তিনি অনেক অনুগ্রহ দেখাইতেন। তাঁহার সখাস্বরূপ নমী নামক ঋষির সহিত তিনি দূর দেশে নমুচি অসুরকে নিপাত করিয়াছিলেন। অতিথিগ্ন রাজার নিমিত্ত করঞ্জ অসুরকে এবং পর্ণয় অসুরকে চক্রদ্বারা বধ করিয়াছিলেন। ঋজিশ্ব রাজা কর্ত্তৃক সম্যক্ বেষ্টিত বংগৃদ অসুরের যে শত সংখ্যক পুরী, ইন্দ্র তাহা সহায়বিহীন হইয়াও একাকী ভগ্ন করিয়াছিলেন:—

ত্বং করঞ্জমুত পর্ণয়ং বধীস্তেজিষ্ঠয়াতিথিগ্বস্য বর্ত্তনী।
ত্বং শতা বংগৃদস্যাভিনৎ পুরোঽনানুদঃ পরিষূতা ঋজিশ্বনা॥১।৫৩।৮

অন্য এক সময়ে তিনি সহায়বিহীন সুশ্রবাঃ রাজাকর্ত্তৃক আক্রান্ত বিংশতি সংখ্যক জনপদাধিপতি এবং তাহাদের ৬০,০৯৯ সৈন্যকে শত্রুনাশক দুর্দ্ধর চক্রদ্বারা বিনাশ করিয়াছিলেন। (১।৫৩।৯)

শ্রীরাজকুমারী দাস।

সুলতানার স্বপ্ন।*

একদা আমার শয়নকক্ষে আরাম কেদারায় বসিয়া ভারতললনার জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলাম,—আমাদের দ্বারা কি দেশের কোন ভাল কাজ হইতে পারে না?—এই সব ভাবিতেছিলাম। সে সময় মেঘমুক্ত আকাশে শারদীয় পূর্ণিমার শশধর পূর্ণগৌরবে শোভমান ছিল; কোটীলক্ষ তারকা শশীকে বেষ্টন করিয়া হীরক-প্রভায় দেদীপ্যমান ছিল। মুক্ত বাতায়ন হইতে কৌমুদীস্নাত উদ্যানটি স্পষ্টই আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। এক একবার মৃদুস্নিগ্ধ সমীরণ শেফালিসৌরভ বহিয়া আনিয়া ঘরখানি আমোদিত করিয়া দিতেছিল। দেখিলাম, সুধাকরের পূর্ণ কান্তি, কুসুমের সুমিষ্ট সৌরভ, সমীরণের সুমন্দ হিল্লোল, রজতচন্দ্রিকা—ইহারা সকলে মিলিয়া আমার সাধের উদ্যানে এক অনির্ব্বচনীয় স্বপ্নরাজ্য রচনা করিয়া ফেলিয়াছে। তদ্দর্শনে আমি আনন্দে আত্মহারা হইলাম,—যেন জাগিয়াই স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম! ঠিক বলিতে পারি না আমি তন্দ্রাভিভূত হইয়াছিলাম কি না;—কিন্তু যতদূর মনে পড়ে, আমার বিশ্বাস আমি জাগ্রত ছিলাম।

সহসা আমার পার্শ্বে একটি ইউরোপীয়া রমণীকে দণ্ডায়মানা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তিনি কি প্রকারে আসিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহাকে আমার পরিচিতা 'ভগিনী সারা' (Sister Sara) বলিয়া বোধ হইল। ভগিনী সারা "সুপ্রভাত" বলিয়া আমাকে অভিবাদন করিলেন। আমি মনে মনে হাসিলাম,—এমন শুভ্র জ্যোৎস্না-প্লাবিত রজনীতে তিনি বলিলেন, "সুপ্রভাত!" তাঁহার দৃষ্টিশক্তি কেমন? যাহা হউক, প্রকাশ্যে আমি প্রত্যুত্তরে বলিলাম,—

"আপনি কেমন আছেন?"

"আমি ভাল আছি, ধন্যবাদ। আপনি একবার আমাদের বাগানে বেড়াইতে আসিবেন কি?"

আমি মুক্তবাতায়ন হইতে আবার পূর্ণিমা-চন্দ্রের

* বর্ত্তমান লেখিকার "Sultana's Dream" গত বৎসর "Indian Ladies' Magazine"এ প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রতি চাহিলাম,—ভাবিলাম, এসময় যাইতে আপত্তি কি? চাকরেরা এখন গভীর নিদ্রামগ্ন; এই অবসরে ভগিনী সারার সমভিব্যাহারে বেড়াইয়া বেশ একটু আনন্দ উপভোগ করা যাইবে।

দার্জ্জিলিং অবস্থানকালে আমি সর্ব্বদাই ভগিনী সারার সহিত ভ্রমণ করিতাম। কত দিন উদ্ভিদকাননে (বোটানিকাল গার্ডেনে) বেড়াইতে বেড়াইতে উভয়ে লতাপাতা সম্বন্ধে—ফুলের লিঙ্গনির্ণয় সম্বন্ধে কত তর্কবিতর্ক করিয়াছি, সে সব কথা মনে পড়িল। ভগিনী সারা সম্ভবতঃ আমাকে তদ্রূপ কোন উদ্যানে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আসিয়াছেন; আমি বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার সহিত বাহির হইলাম।

ভ্রমণকালে দেখি কি—এত সে জ্যোৎস্নাময়ী রজনী নহে!—এযে দিব্য প্রভাত! নগরের লোকেরা জাগিয়া উঠিয়াছে, রাজপথে লোকে লোকারণ্য! কি বিপদ! আমি দিনের বেলায় এভাবে পথে বেড়াইতেছি! ইহা ভাবিয়া লজ্জায় জড়সড় হইলাম—যদিও পথে একজনও পুরুষ দেখিতে পাই নাই।

পথিকা স্ত্রীলোকেরা আমার দিকে চাহিয়া হাস্য পরিহাস করিতেছিল। আমি তাহাদের ভাষা না বুঝিলেও ইহা স্পষ্ট বুঝিলাম, যে তাহাদের উপহাসের লক্ষ্য বেচারী আমিই। সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"উহারা কি বলিতেছে?"

উত্তর পাইলাম,—"উহারা বলে, যে আপনি অনেকটা পুরুষভাবাপন্ন।"

"পুরুষভাবাপন্ন! ইহার মানে কি?"

"ইহার অর্থ এই, যে আপনাকে পুরুষের মত ভীরু ও লজ্জানম্র দেখায়!"

"পুরুষের মত লজ্জানম্র!" এমন ঠাট্টা! এরূপ উপহাস ত কখন শুনি নাই! ক্রমে বুঝিতে পারিলাম, আমার সঙ্গিনী সে দার্জ্জিলিংবাসিনী ভগিনী সারা নহেন,—ইঁহাকে পূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। ওহো! আমি কেমন বোকা—একজন অপরিচিতার সহিত হঠাৎ চলিয়া আসিলাম! কেমন একটু বিস্ময়ে ও ভয়ে অভিভূত হইলাম। আমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত ও ঈষৎ কম্পিত হইল। তাঁহার হাত ধরিয়া চলিতেছিলাম কি না, তিনি আমার হস্তকম্পন অনুভব করিয়া সস্নেহে বলিলেন,—

"আপনার কি হইয়াছে? আপনি কাঁপিতেছেন যে!"

এরূপে ধরা পড়ায় আমি লজ্জিত হইলাম। ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম, "আমার কেমন একটু সঙ্কোচ বোধ হইতেছে; আমরা পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোক, আমাদের বিনা অবগুণ্ঠনে বাহির হইবার অভ্যাস নাই।"

"আপনার ভয় নাই—এখানে আপনি কোন পুরুষের সম্মুখে পড়িবেন না। এ দেশের নাম 'নারীস্থান,' * এখানে স্বয়ং পুণ্য নারীবেশে রাজত্ব করেন।"

ক্রমে নগরের দৃশ্যাবলী দেখিয়া আমি অন্যমনস্ক হইলাম। বাস্তবিক পথের উভয় পার্শ্বস্থিত দৃশ্য অতিশয় রমণীয় ছিল। সুনীল অম্বর দর্শনে মনে হইল যেন ইতিপূর্ব্বে আর কখন এত পরিষ্কার আকাশ দেখি নাই! একটী তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর দেখিয়া ভ্রম হইল, যেন হরিৎ মখমলের গালিচা পাতা রহিয়াছে। ভ্রমণ কালে আমার বোধ হইতেছিল, যেন কোমল মসনদের উপর বেড়াইতেছি,—ভূমির দিকে দৃক্‌পাত করিয়া দেখি, পথটী শৈবাল ও বিবিধ পুষ্পে আবৃত! আমি তখন সানন্দে বলিয়া উঠিলাম, "আহা! কি সুন্দর!"

ভগিনী সারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এ সব পসন্দ করেন কি?" (আমি তাঁহাকে 'ভগিনী সারা'ই বলিতে থাকিলাম, এবং তিনিও আমার নাম ধরিয়া সম্বোধন করিতেছিলেন।)

"হাঁ এসব দেখিতে বড়ই চমৎকার। কিন্তু আমি এ সুকুমার কুসুম-স্তবক পদদলিত করিতে চাই না।"

"সে জন্য ভাবিবেন না, প্রিয় সুলতানা! আপনার পদস্পর্শে এ ফুলের কোন ক্ষতি হইবে না। এগুলি বিশেষ এক জাতীয় ফুল, ইহা রাজপথেই রোপণ করা হয়।"

দুইধারে পুষ্পচূড়াধারী পাদপশ্রেণী সহাস্যে শাখা

* "পরীস্থান" শব্দের অনুকরণে "নারীস্থান" বলা হইল। ইংরাজীতে "লেডী-ল্যাণ্ড" বলা গিয়াছে।

দোলাইয়া দোলাইয়া যেন আমার অভ্যর্থনা করিতেছিল। দূরাগত কেতকী-সৌরভে দিক্ পরিপূরিত ছিল। সে সৌন্দর্য্য ভাষায় ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য—আমি মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে বলিলাম, "সমস্ত নগরখানি একটি কুঞ্জভবনের মত দেখায়। যেন ইহা প্রকৃতি-রাণীর লীলাকানন। আপনাদের উদ্যানরচনা-নৈপুণ্য অত্যন্ত প্রশংসনীয়।"

"ভারতবাসী ইচ্ছা করিলে কলিকাতাকে ইহা অপেক্ষা অধিক সুন্দর পুষ্পোদ্যানে পরিণত করিতে পারেন।"

"তাঁহাদিগকে অনেক গুরুতর কার্য্য করিতে হয়, তাঁহারা কেবল উপবনের উন্নতিকল্পে অধিক সময় ব্যয় করা অনাবশ্যক মনে করিবেন।"

"ইহা ছাড়া তাঁহারা আর কি বলিতে পারেন? জানেন ত অলসেরা অতিশয় বাক্‌পটু হয়!"

আমার বড় আশ্চর্য্যবোধ হইতেছিল, যে দেশের পুরুষেরা কোথায় থাকে? রাজপথে শতাধিক ললনা দেখিলাম, কিন্তু পুরুষ বলিতে একটী বালক পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইল না। শেষে কৌতূহল গোপন করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "পুরুষেরা কোথায়?"

উত্তর পাইলাম, "যেখানে তাহাদের থাকা উচিত সেই খানে, অর্থাৎ তাহাদের উপযুক্ত স্থানে।"

ভাবিলাম, তাহাদের "উপযুক্ত স্থান" আবার কোথায়, আকাশে না পাতালে? পুনরায় বলিলাম, "মাফ করিবেন, আপনার কথা ভালমতে বুঝিতে পারিলাম না। তাহাদের 'উপযুক্ত স্থানের' অর্থ কি?"

"ওহো! আমার কি ভ্রম!—আপনি আমাদের নিয়ম আচার জ্ঞাত নহেন, একথা আমার মনেই ছিল না। এ দেশে পুরুষজাতি গৃহাভ্যন্তরে অবরুদ্ধ থাকে।"

"কি! যেমন আমরা অন্তঃপুরে থাকি, সেইরূপ তাঁহারাও থাকেন না কি?"

"হাঁ, ঠিক তদ্রূপই।"

"বাঃ! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!" বলিয়া আমি উচ্চ-হাস্য করিলাম। ভগিনী সারাও হাসিলেন! আমি প্রাণে বড় আরাম পাইলাম;—পৃথিবীতে অন্ততঃ এমন একটি দেশও আছে, যেখানে পুরুষজাতি অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ থাকে! ইহা ভাবিয়া অনেকটা সান্ত্বনা অনুভব করা গেল!

তিনি বলিলেন, "ইহা কেমন অন্যায়, যে নিরীহ রমণী অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকে, আর পুরুষেরা মুক্ত স্বাধীনতা ভোগ করে। কি বলেন, সুলতানা, আপনি ইহা অন্যায় মনে করেন না?"

আমি আজন্ম অন্তঃপুরবাসিনী, আমি এ প্রথাকে অন্যায় মনে করিব কিরূপে? প্রকাশ্যে বলিলাম,—"অন্যায় কিসের? রমণী স্বভাবতঃ দুর্ব্বলা, তাহাদের পক্ষে অন্তঃপুরের বাহিরে থাকা নিরাপদ নহে।"

"হাঁ, নিরাপদ নহে ততদিন,—যতদিন পুরুষজাতি বাহিরে থাকে! তা কোন বন্য জন্তু কোন একটা গ্রামে আসিয়া পড়িলেও ত সে গ্রামখানি নিরাপদ থাকে না। কি বলেন?"

"তাহা ঠিক; হিংস্রজন্তুটা ধরা না পড়া পর্য্যন্ত গ্রামটি নিরাপদ হইতে পারে না।"

"মনে করুন, কতকগুলি পাগল যদি বাতুলাশ্রম হইতে বাহির হইয়া পড়ে, আর তাহারা অশ্ব, গবাদি—এমন কি ভাল মানুষের প্রতিও নানা প্রকার উপদ্রব উৎপীড়ন আরম্ভ করে, তবে ভারতবর্ষের লোকে কি করিবে?"

"তবে তাহারা পাগলগুলিকে ধরিয়া পুনরায় বাতুলা-গারে আবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইবে।"

"বেশ! বুদ্ধিমান লোককে বাতুলালয়ে আবদ্ধ রাখিয়া দেশের সমস্ত পাগলকে মুক্তি দেওয়াটা বোধ হয় আপনি ন্যায়সঙ্গত মনে করেন না?"

"অবশ্যই না! শান্তশিষ্ট লোককে বন্দী করিয়া পাগলকে মুক্তি দিবে কে?"

"কিন্তু কার্য্যতঃ আপনাদের দেশে আমরা ইহাই দেখিতে পাই! পুরুষেরা—যাহারা নানা প্রকার দুষ্টামী করে, বা অন্ততঃ করিতে সক্ষম, তাহারা দিব্য স্বাধীনতা ভোগ করে, আর নিরীহ কোমলাঙ্গী অবলারা বন্দিনী থাকে! অশিক্ষিত অমার্জ্জিতরুচি পুরুষেরা বিনা শৃঙ্খলে থাকিবার উপযুক্ত নহে। আপনারা কিরূপে তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন?"

"জানেন, ভগিনী সারা! সামাজিক বিধিব্যবস্থার উপর আমাদের কোন হাত নাই। ভারতে পুরুষজাতি প্রভু,—তাহারা সমুদয় সুখ সুবিধা ও প্রভুত্ব আপনাদের জন্য হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছে, আর সরলা অবলাকে অন্তঃপুর রূপ পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিয়াছে! উড়িতে শিখিবার পূর্ব্বেই আমাদের ডানা কাটিয়া দেওয়া হয়—তদ্ব্যতীত সামাজিক রীতিনীতির কত শত কঠিন শৃঙ্খল পদে পদে জড়াইয়া আছে।"

"তাই ত! আমার বলিতে ইচ্ছা হয়,—'দোষ কার, বন্দী হয় কে!' কিন্তু বলি, আপনারা 'ওসব নিগড় পরেন কেন?"

"না পরিয়া করি কি? 'জোর যার মুলুক তার'; যাহার বল বেশী, সেই স্বামিত্ব করিবে—ইহা অনিবার্য্য।"

"কেবল শারীরিক বল বেশী হইলেই কেহ প্রভুত্ব করিবে, ইহা আমরা স্বীকার করি না। সিংহ কি বলে বিক্রমে মানবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে? তাই বলিয়া কি কেশরী মানবজাতির উপর প্রভুত্ব করিবে? আপনাদের কর্ত্তব্যের ক্রটী হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আপনারা সমাজের উপর কর্তৃত্ব ছাড়িয়া একাধারে নিজের প্রতি অত্যাচার এবং স্বদেশের অনিষ্ট দুই-ই করিয়াছেন। আপনাদের কল্যাণে সমাজ আরও উন্নত হইত—আপনাদের সাহায্য অভাবে সমাজ অর্দ্ধেক শক্তি হারাইয়া দুর্ব্বল ও অবনত হইয়া পড়িয়াছে।"

"শুনুন ভগিনী সারা! যদি আমরাই সংসারের সমুদয় কার্য্য করি, তবে পুরুষেরা কি করিবে?"

"তাহারা কিছুই করিবে না,—তাহারা কোন ভাল কাজের উপযুক্ত নহে। তাহাদিগকে ধরিয়া অন্তঃপুরে বন্দী করিয়া রাখুন।"

"কিন্তু ক্ষমতাশালী নরবরদিগকে চতুষ্প্রাচীরের অভ্যন্তরে বন্দী করা কি সম্ভব, না সহজ ব্যাপার? আর তাহা যদিই সাধিত হয়, তবে দেশের যাবতীয় কার্য্য—যথা রাজকার্য্য, বাণিজ্য ইত্যাদি—সকল কাজই অন্তঃপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিবে যে!"

এবার ভগিনী সারা কিছু উত্তর দিলেন না; সম্ভবতঃ আমার ন্যায় অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন অবলার সহিত তর্ক করা তিনি অনাবশ্যক মনে করিলেন!

ক্রমে আমরা ভগিনী সারার গৃহতোরণে উপনীত হইলাম। দেখিলাম, বাড়ীখানি একটী বৃহৎ হৃদয়াকৃতি উদ্যানের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এ ভাবটি কি চমৎকার!—ধরিত্রী জননীর হৃদয়ে মানবের বাসভবন! বাড়ী বলিতে, একটি টীনের বাঙ্গালা মাত্র, কিন্তু সৌন্দর্য্যে ও নৈপুণ্যে ইহার নিকট আমাদের দেশের বড় বড় রাজপ্রাসাদ পরাজিত! সাজ সজ্জা কেমন নয়নাভিরাম ছিল, তাহা ভাষায় বর্ণনীয় নহে—তাহা কেবল দেখিবার জিনিস!

আমরা উভয়ে পাশাপাশি উপবেশন করিলাম। তিনি সেলাই করিতে আরম্ভ করিলেন; একটি খঞ্চিপোষে রেশমের কাজ করা হইতেছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমিও সেলাই জানি কি না! আমি বলিলাম,—

"আমরা অন্তঃপুরে থাকি, সেলাই ব্যতীত অন্য কাজ জানি না।"

"কিন্তু এদেশের অন্তঃপুরবাসীদের হাতে আমরা কারচোবের কাজ দিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না!" এই বলিয়া তিনি হাসিলেন; "পুরুষদের এত খানি সহিষ্ণুতা কই, যে তাহারা ধৈর্য্যের সহিত ছুঁচে সুতা পরাইবে?"

তাহা শুনিয়া আমি বলিলাম, "তবে কি কারচোবের কাজগুলি সব আপনিই করিয়াছেন?" তাঁহার ঘরে বিবিধ ত্রিপদীর উপর নানা প্রকার সলমা চুমকির কারুকার্য্যখচিত বস্ত্রাবরণ ছিল।

তিনি বলিলেন, "হাঁ, এ সব আমারই স্বহস্তপ্রস্তুত।"

"আপনি কিরূপে সময় পান? আপনাকে ত আফিসের কাজও করিতে হয়, না? কি বলেন?"

"হাঁ। তা আমি সমস্ত দিন রসায়নাগারে আবদ্ধ থাকি না। আমি দুই ঘণ্টায় দৈনিক কর্ত্তব্য শেষ করি।"

"দুই ঘণ্টায়! আপনি একি বলেন?—দুই ঘণ্টায় আপনার কার্য্য শেষ হয়! আমাদের দেশে রাজকর্ম্মচারীগণ—যেমন ম্যাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ, জজ প্রভৃতি প্রতিদিন ৭ ঘণ্টা কাজ করিয়া থাকেন!"

"আমি ভারতের রাজপুরুষদের কার্য্যপ্রণালী দেখি-

য়াছি। আপনি কি মনে করেন, যে তাঁহারা সাত আট ঘণ্টাকাল অনবরত কাজ করেন?"

"নিশ্চয়! বরং এতদপেক্ষা অধিক পরিশ্রমই করেন।"

"না প্রিয় সুলতানা! ইহা আপনার ভ্রম। তাঁহারা অলসভাবে বেত্রাসনে বসিয়া ধূমপানে সময় অতিবাহিত করেন! কেহ আবার আফিসে থাকিয়া ক্রমাগত দুই তিনটি চুরুট ধ্বংস করেন। তাঁহারা মুখে যত বলেন, কার্য্যতঃ তত করেন না। রাজপুরুষেরা যদি কিছু করেন ত তাহা এই, যে কেবল তাঁহাদের নিয়তন কর্ম্মচারীদের ছিদ্রান্বেষণ! মনে করুন একটি চুরুট ভস্মীভূত হইতে অর্দ্ধঘণ্টা সময় লাগে, আর কেহ দৈনিক ১২টি চুরুট ধ্বংস করেন, তবে সে ভদ্রলোকটি প্রতিদিন ধূমপানে মাত্র ছয় ঘণ্টা সময় ব্যয় করেন!"

তাই ত! অথচ ভ্রাতৃমহোদয়গণ জীবিকা অর্জ্জন করেন, এই অহঙ্কারেই বাঁচেন না! ভগিনী সারার সহিত বিবিধ প্রসঙ্গ হইল। শুনিলাম, তাঁহাদের নারীস্থান কখনও মহামারী রোগে আক্রান্ত হয় না। আর তাঁহারা আমাদের ন্যায় হুলধর মশার দংশনেও অধীর হন না! বিশেষ একটি কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম,—নারীস্থানে নাকি কাহারও অকাল-মৃত্যু হয় না। তবে বিশেষ কোন দুর্ঘটনা হইলে লোকে অপ্রাপ্ত বয়সে মরে, সে স্বতন্ত্র কথা। ভগিনী সারা আবার হিন্দুস্থানের অসংখ্য শিশুর মৃত্যু সংবাদে অবাক হইলেন। তাঁহার মতে যেন এই ঘটনা সর্ব্বাপেক্ষা অসম্ভব! তিনি বলিলেন, যে প্রদীপ সবে মাত্র তৈল সলিতা যোগে জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে কেন (তৈল বর্ত্তমানে) নির্ব্বাপিত হইবে? যে নব কিশলয় সবে মাত্র অঙ্কুরিত হইয়াছে, সে কেন পূর্ণতা প্রাপ্তির পূর্ব্বে ঝরিবে!

ভারতের প্লেগ সম্বন্ধেও অনেক কথা হইল; তিনি বলিলেন, "প্লেগ টেলেগ কিছু নহে—কেবল দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত লোকেরা নানা রোগের আধার হইয়া পড়ে। একটু অনুধাবন করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, গ্রাম অপেক্ষা নগরে প্লেগ বেশী,—নগরের ধনী অপেক্ষা নির্ধনের ঘরে প্লেগ বেশী হয়, এবং প্লেগে দরিদ্র পুরুষ অপেক্ষা দরিদ্র রমণী অধিক মারা যায়। সুতরাং সহজেই বুঝা যায়, প্লেগের মূল কোথায়—মূল কারণ ঐ অন্নাভাব। আমাদের এখানে প্লেগ বা ম্যালেরিয়া আসুক ত দেখি!"

তাই ত, ধনধান্যপূর্ণা নারীস্থানে ম্যালেরিয়া কিম্বা প্লেগের অত্যাচার হইবে কেন? প্লীহা-স্ফীত-উদর ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট বাঙ্গালায় দরিদ্রদিগের অবস্থা ভাবিয়া আমি নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলাম।

অতঃপর তিনি আমাকে তাঁহাদের রন্ধনশালা প্রদর্শন জন্য লইয়া গেলেন। অবশ্য যথাবিধি পর্দা করিয়াই যাওয়া হইয়াছিল! একি রন্ধন-গৃহ, না নন্দন-কানন? রন্ধনশালার চতুর্দ্দিকে মনোরম সবজীবাগান—বিবিধ তরিতরকারীর লতাগুল্মে পরিপূর্ণ। ঘরের ভিতর ধূম বা ইন্ধনের কোন চিহ্ন নাই,—মেজেখানি অমল ধবল মর্ম্মর প্রস্তর-নির্ম্মিত; মুক্ত বাতায়নগুলি সদ্যগ্রথিত পুষ্পদামে সুসজ্জিত! আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"আপনারা রাঁধেন কিরূপে? কোথাও ত অগ্নি জ্বালিবার স্থান দেখিতেছি না!"

তিনি বলিলেন, "সূর্য্যোত্তাপে রান্না হয়।" অতঃপর কি প্রকারে সৌরকর একটা নলের ভিতর দিয়া আইসে, সেই নলটা তিনি আমাকে দেখাইলেন। কেবল ইহাই নহে; তিনি তৎক্ষণাৎ এক পাত্র ব্যঞ্জন (যাহা পূর্ব্ব হইতে তথায় রন্ধনের নিমিত্ত প্রস্তুত ছিল) রাঁধিয়া আমাকে সেই অদ্ভুত রন্ধনপ্রণালী দেখাইলেন!

আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনারা সৌরোত্তাপ সংগ্রহ করেন কি প্রকারে?"

ভগিনী বলিলেন, "কিরূপে সৌরকর আমাদের করায়ত্ত হইয়াছে, তাহার ইতিহাস শুনিবেন? ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমাদের বর্ত্তমান মহারাণী সিংহাসন প্রাপ্ত হন, তখন তিনি ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা ছিলেন। তিনি নামতঃ রাণী ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে প্রধান মন্ত্রীই রাজ্যশাসন করিতেন।

"মহারাণী বাল্যকাল হইতেই বিজ্ঞান চর্চ্চা করিতে ভালবাসিতেন। সাধারণ রাজকন্যাদের ন্যায় তিনি

শকুন্তলা পত্রলেখন।

বৃথা সময় যাপন করিতেন না। একদিন তাঁহার খেয়াল হইল, যে তাঁহার রাজ্যের সমুদয় স্ত্রীলোকই সুশিক্ষা প্রাপ্ত হউক। মহারাণীর খেয়াল,—সে খেয়াল তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত হইল! অচিরে গবর্ণমেন্ট পক্ষ হইতে অসংখ্য বালিকাস্কুল স্থাপিত হইল। এমন কি পল্লী-গ্রামেও উচ্চশিক্ষার অমিয়-স্রোত প্রবাহিত হইল। শিক্ষার বিমল জ্যোতিতে কুসংস্কাররূপ অন্ধকার তিরোহিত হইতে লাগিল, এবং বাল্যবিবাহ-প্রথাও রহিত হইল। একুশ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে কোন কন্যার বিবাহ হইতে পারিবে না—এই আইন হইল। আর এক কথা, এই পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে আমরাও আপনাদের মত কঠোর অবরোধে বন্দিনী থাকিতাম।"

"এখন কিন্তু বিপরীত অবস্থা!" এই বলিয়া আমি হাসিলাম।

"কিন্তু স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে ব্যবধান ত সেই প্রকারই আছে! কতকদিন তাঁহারা বাহিরে, আমরা ঘরে ছিলাম; এখন তাঁহারা ঘরে, আমরা বাহিরে আছি! পরিবর্ত্তন প্রকৃতিরই নিয়ম! কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় হইল; তথায় বালকদের প্রবেশ নিষেধ ছিল।"

"আমাদের পৃষ্ঠপোষিকা স্বয়ং মহারাণী,—আর কি কোন অভাব থাকিতে পারে? অবলাগণ অত্যন্ত নিবিষ্ট-চিত্তে বিজ্ঞান আলোচনা আরম্ভ করিলেন। এই সময় রাজধানীর একতর বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা-প্রিন্সিপাল একটি অভিনব বেলুন নির্ম্মাণ করিলেন; এই বেলুনে কতকগুলি নল সংযোগ করা হইল। বেলুনটি শূন্যে মেঘের উপর স্থাপন করা গেল,—বায়ুর আর্দ্রতা ঐ বেলুনে সংগ্রহ করিবার উপায় ছিল,—এইরূপে জলধরকে ফাঁকি দিয়া তাঁহারা বৃষ্টিজল করায়ত্ত করিলেন! বিদ্যালয়ের লোকেরা সর্ব্বদা ঐ বেলুনের সাহায্যে জল গ্রহণ করিত কি-না, তাই আর মেঘমালায় আকাশ আচ্ছন্ন হইতে পারিত না। এই অদ্ভুত উপায়ে বুদ্ধিমতী লেডী প্রিন্সিপাল প্রাকৃতিক ঝড় বৃষ্টি নিবারণ করিলেন।"

"বটে? তাই আপনাদের এখানে পথে কর্দ্দম দেখিলাম না!" কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না,—নলের ভিতর বায়ুর আর্দ্রতা কিরূপে আবদ্ধ থাকিতে পারে; আর ঐরূপে বায়ু হইতে জল সংগ্রহ করাই বা কিরূপে সম্ভব? তিনি আমাকে ইহা বুঝাইতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আমার যে বুদ্ধি!—তাহাতে আবার বিজ্ঞান রসায়নের সঙ্গে আমাদের (অর্থাৎ মোসলেম ললনাদের) কোন পুরুষে পরিচয় নাই! সুতরাং ভগিনী সারার ব্যাখ্যা কোন মতেই আমার বোধগম্য হইল না। যাহা হউক তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন:—

"দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই জলধর-বেলুন দর্শনে অতীব বিস্মিত হইল,—অতিহিংসায় * তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সহস্রগুণ বর্দ্ধিত হইল। প্রিন্সিপাল মনস্থ করিলেন, যে এমন কিছু অসাধারণ বস্তু সৃষ্টি করা চাই, যাহাতে কাদম্বিনী-বিজয়ী বিদ্যালয়কে পরাভূত করা যায়! তাঁহারা অল্পকাল মধ্যে একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন, তদ্দ্বারা সূর্য্যোত্তাপ সংগ্রহ করা যায়। কেবল ইহাই নহে,—তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে ঐ উত্তাপ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে এবং ইচ্ছামত যথা তথা বিতরণ করিতে পারেন।"

"যৎকালে এদেশের রমণীবৃন্দ নানাবিধ বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে নিযুক্ত ছিলেন, পুরুষেরা তখন সৈনিক বিভাগের বলবৃদ্ধির চেষ্টায় ছিলেন। যখন নরবীরগণ শুনিতে পাইলেন, যে জেনানা বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয় বায়ু হইতে জলগ্রহণ করিতে এবং সূর্য্যোত্তাপ সংগ্রহ করিতে পারে, তাঁহারা তাচ্ছিল্যের ভাবে হাসিলেন। এমন কি তাঁহারা বিদ্যালয়ের সমুদয় কার্য্যপ্রণালীকে 'স্বপ্ন-কল্পনা' বলিয়া উপহাস করিতেও বিরত হন নাই!"

আমি বলিলাম, "আপনাদের কার্য্যকলাপ বাস্তবিক অত্যন্ত বিস্ময়কর! কিন্তু এখন বলুন দেখি, আপনারা পুরুষদের কি প্রকারে অন্তঃপুরে বন্দী করিলেন? কোন-রূপ ফাঁদ পাতিয়াছিলেন না কি?"

* হিংসা বৃত্তিটা কি বাস্তবিক বড় দোষনীয়? কিন্তু হিংসা না থাকিলে প্রতিদ্বন্দিতার ইচ্ছা হয় কই? এই হিংসাই ত মানবকে উন্নতির দিকে আকর্ষণ করে। তবে দেশকাল ভেদে ইর্ষায় পতন হয়, সত্য। তা যে কোন মনোবৃত্তির মাত্রাধিক্যেই অনিষ্ট হয়; সকল বিষয়েরই সীমা আছে।

ভগিনী বলিলেন, "না।"

"তাঁহারা যে নিজে ধরা দিবেন ইহাও ত সম্ভব নয়। মুক্ত স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়া স্বেচ্ছায় চতুষ্প্রাচীরের অভ্যন্তরে বন্দী হইবে কোন্ পাগল? তবে অবশ্যই পুরুষেরা কোনরূপে আপনাদের দ্বারা পরাভূত হইয়াছিলেন।"

"হাঁ, তাই বটে!"

"কে প্রথমে পুরুষপ্রবরদের পরাভূত করিল,—সম্ভবতঃ কতিপয় নারীযোদ্ধা?"

"না, এদেশের পুরুষদল বাহুবলে পরাস্ত হয় নাই।"

"হাঁ, ইহা অসম্ভবও বটে, কারণ পুরুষের বাহু নারীর বাহু অপেক্ষা দুর্ব্বল নহে। তবে?"

"মস্তিষ্ক বলে।"

"তাহাদের মস্তিষ্ক ও ত রমণীর তুলনায় বৃহত্তর ও গুরুতর। না?—কি বলেন?"

"মস্তিষ্ক গুরুতর হইলেই কি? হস্তীর মস্তিষ্কও ত মানবের তুলনায় বৃহৎ এবং ভারী, তবু ত মানুষ হস্তীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছে!"

"ঠিক ত! কিন্তু কি প্রকারে কর্ত্তারা বন্দী হইলেন, এ কথা জানিবার জন্য আমি বড় উৎসুক হইয়াছি। শীঘ্র বলুন—আর বিলম্ব সহে না!"

"স্ত্রীলোকের মস্তিষ্ক পুরুষের অপেক্ষা ক্ষিপ্রকারী, এ কথা অনেকেই স্বীকার করেন। পুরুষ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে অনেক ভাবে—অনেক যুক্তি তর্কের সাহায্যে বিষয়টি বোধগম্য করে। কিন্তু রমণী বিনা চিন্তায় হঠাৎ সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। যাহা হউক, দশ বৎসর পূর্ব্বে যখন সৈনিক বিভাগের কর্ম্মচারীগণ আমাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইত্যাদিকে 'স্বপ্ন-কল্পনা' বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন, তখন কতিপয় ছাত্রী তদুত্তরে কিছু বলিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লেডীপ্রিন্সিপাল দ্বয় বাধা দিলেন। তাঁহারা বলিলেন, যে তোমরা বাক্যে উত্তর না দিয়া সুযোগ পাইলে কার্য্য দ্বারা উত্তর দিও। ঈশ্বর কৃপায় এই উত্তর দিবার সুযোগের জন্য ছাত্রীদিগকে অধিক দিন অপেক্ষা করিতে হয় নাই।"

"ভারী আশ্চর্য্য!" আমি অতি আনন্দে আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া করতালি দিয়া বলিলাম, "এখন দাম্ভিক ভদ্রলোকেরা অন্তঃপুরে বসিয়া 'স্বপ্ন-কল্পনায়' বিভোর রহিয়াছেন!"

(ক্রমশঃ)

মতীচুর-রচয়িত্রী।

ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র।*

[জন্ম ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ,
মৃত্যু ৬ই জানুয়ারী, ১৮৮২।]

অদ্য যে মহানুভবের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিতেছি, তাঁহাকে হিন্দী জগতের বিদ্যাসাগর বা আধুনিক হিন্দী সাধু ভাষার জন্মদাতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইঁহার স উপাধি নাম 'ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র'।

ইঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা প্রথমে ভারতের রাজধানী দিল্লী-নগরে বাস করিতেন। মোগল সম্রাটদিগের রাজকার্য্যের সহিত ইঁহাদের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। সম্রাট সাজাহানের পুত্র সাহসুজা যখন বঙ্গদেশের সুবাদার হইয়া বাঙ্গালায় আইসেন, ইঁহার পূর্ব্বপুরুষেরাও সেই সঙ্গে বঙ্গদেশে আগমন করেন। বঙ্গদেশের তদানীন্তন সমৃদ্ধিশালী নগর রাজমহল ও মুরশিদাবাদে তাঁহারা প্রথম বসবাস করেন। উক্ত উভয় স্থানে অদ্যাপি তাঁহাদের বাসস্থানের ভগ্নাবশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

ইংরাজ-শাসনের প্রারম্ভে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শেঠ অমিচাঁদের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রদ্বয় কাশীতে চলিয়া আইসেন। অমিচাঁদের দ্বিতীয় পুত্র সাহ ফতেচাঁদই বর্ত্তমান চরিত্র-নায়কের প্রপিতামহ। বলা বাহুল্য, ইঁহারা সে সময় কাশীর বিখ্যাত ধনসম্পদশালী শ্রেষ্ঠী ছিলেন।

ভারতেন্দুর বয়ঃক্রম যখন নয় বৎসর সেই সময় তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার পিতা সে সময়কার হিন্দী সাহিত্য-সংসারে কবি বলিয়া খ্যাত ছিলেন। পাঁচ ছয় বৎসর বয়সে ইনি স্বীয় কবিত্বশক্তিতে কাব্যানুরাগী

---

* কাশীর "নাগরী প্রচারিণী" সভার সম্পাদক, হিন্দী ভাষায় "স্বর্ণলতা" প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদক, শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ দাস মহাশয়ের হিন্দীভাষায় লিখিত প্রবন্ধের মর্ম্মানুবাদ।

পিতাকে চমৎকৃত করেন। বাল্যকালে ইঁহার পিতা কোন কাব্যগ্রন্থ লিখিতেছিলেন, বালক-পুত্রও সেই সময় পিতৃসমীপে আব্দার করিলেন, "আমিও কবিতা লিখিব!" বালক যে দুই ছত্র কবিতা লিখিলেন, পিতা সাদরে তাহা স্বরচিত পুস্তকে স্থান দিলেন। পুত্রের ভাবী প্রতিভা স্মরণ করিয়া তিনি আনন্দ-গদ্‌গদ্ চিত্তে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তুই আমার নাম বজায় রাখিবি।" এখন পিতার আত্মা আসিয়া দেখুন, পুত্র শুধু তাঁহারই নহে, তাঁহার দেশেরও মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

একদা তাঁহার পিতার সভায় তাঁহার রচিত কোন কাব্যের ব্যাখ্যা হইতেছিল। বালক ভারতেন্দুও সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন; তিনিও নিজ বুদ্ধি অনুসারে একটী ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া সভাস্থ সকলেই বিমোহিত হইলেন। পিতা সাশ্রুনেত্রে পুত্রের মুখ-চুম্বন করিলেন। ইঁহার বুদ্ধি বাল্যাবস্থা হইতেই প্রখর ও অনুসন্ধিৎসাপ্রিয় ছিল। একবার পিতাকে তর্পণ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বাবা! জলে জল ঢালিলে কি হয়?" পরম ধার্ম্মিক পিতৃদেব তখনি শিরে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "বোধ হয় তোর দ্বারাই আমার বংশ নাশ হইবে।" পিতার আশীর্ব্বাদ ও অভিশাপ উভয়ই যথাসময়ে কিয়ৎপরিমাণে ফলীভূত হইয়াছিল। ভারতেন্দু যেরূপ কুলের মুখোজ্জ্বলকারী হইয়াছিলেন, সেইরূপ নিজ পৈতৃক অতুল সম্পত্তির বিনাশকারীও হ'ন। অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়া ইনি কিছু স্বাধীন প্রকৃতির হইয়াছিলেন। কালে যাঁহার স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ও স্বদেশীয় মান্যগণ্য ব্যক্তিদের ভয়ে ভীত হয় নাই, তাঁহাকে কি কেহ নিজ অধীনে রাখিতে পারে? তাহার উপর আবার অভিভাবকের মধ্যে ছিলেন বিমাতা ও কর্ম্মচারিগণ! তিনি যে স্বাধীন প্রকৃতির লোক হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

ইংরাজী শিক্ষার জন্য ইঁহাকে কলেজে ভর্ত্তি করা হয়। সে সময় ইংরাজী বিদ্যালয় সমূহে ছাত্রবর্গের চরিত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত। পান খাইয়া কলেজে যাওয়া নিষেধ ছিল। ইনি নিতান্ত চপল ও উদ্ধত স্বভাবের লোক ছিলেন, এসকল বিষয়ে ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। বাটী হইতে একরাশি পান খাইয়া বাহির হইতেন; পথিমধ্যে ইঁহাদের বাগান-বাড়ী ছিল, সে স্থানে মুখ ধুইয়া কলেজে যাইতেন। লেখাপড়ার প্রতি যথোচিত মনোযোগ ছিল না, কিন্তু তথাপি কখন কোন পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হ'ন নাই। দু'এক বার আলোচনা করিলেই অধীত বিষয় উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম হইত। শিক্ষকেরা ইঁহার বুদ্ধির প্রখরতা দেখিয়া চমৎকৃত হইতেন।

সে সময় এ প্রান্তে ইংরাজী শিক্ষার অত্যন্ত অভাব ছিল। ধনবানদিগের মধ্যে কেবল রাজা শিবপ্রসাদ মহোদয়ই ইংরাজী জানিতেন, তন্নিমিত্ত উঁহার বিশেষ সম্মান ছিল। ভারতেন্দুও তাঁহার কাছে ইংরাজী পড়িতে যাইতেন।

কলেজে ইঁহার ইংরাজীর সহিত দ্বিতীয় ভাষা (Second Language) সংস্কৃত ছিল। এই সময় হইতে ইনি কবিতার বিশেষ পক্ষপাতী হন। ইঁহার রচিত সংস্কৃত কবিতাগুলি প্রায় প্রাচীন সংস্কৃত কবিতার অনুযায়ী হইত।

পঠদ্দশায় অন্তঃপুরিকাদিগের আগ্রহে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইঁহারা পুরুষোত্তম যাত্রা করেন। এই সময় হইতে ইঁহার জীবনের প্রধান পরিবর্ত্তন ঘটে। ভাল কিম্বা মন্দ যে ঘটনাগুলি ইঁহার জীবনসঙ্গী হয় তাহার সূত্রপাত এই সময় হইতে এবং বিদ্যাভ্যাসের 'ইতি'ও এই সময়েই হয়। তখন কেহ কোন দূর স্থানে যাত্রা করিলে আত্মীয় স্বজনেরা কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিতেন। সেই প্রথা অনুসারে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়গণ ইঁহাদিগকে কিছু দূর পর্য্যন্ত রাখিয়া গেলেন। ধনবান লোকের পুত্রের উপর অর্থলোলুপদিগের দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রেই পতিত হয়,—বিশেষতঃ পিতৃহীন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের উপর। উপরোক্ত উদার শ্রেণীর এক মহাশয়ও ভারতেন্দুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। কিছুক্ষণ বার্ত্তালাপ হইবার পর ইনি নির্জ্জনে ভারতেন্দুকে দুইটি স্বর্ণমুদ্রা দিলেন। বালক আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "মোহর লইয়া কি হইবে?" শুভাকাঙ্ক্ষী মহাশয় বলিলেন, "আপনি দূর তীর্থস্থানে যাইতেছেন, সঙ্গে কিছু

১৩৯ ১৩৯

অর্থ থাকা ভাল।” বালক উত্তর দিলেন, আমার সহিত আমার সরকার গোমস্তা যাইতেছেন, টাকা পয়সাও প্রচুর যাইতেছে, তবে এই মোহর লইয়া কি হইবে?” উত্তর হইল, “আপনি ছেলে মানুষ, কিছু বুঝিতে পারেন না; আমি পুরুষানুক্রমে আপনাদের নুন খাইয়াছি, সেই জন্য এতটা ভাবিয়া থাকি; আমার কথা শুনুন! এদুটো আপনার কাছেই থাক্, যদি দরকার হয় ত' খরচ করিবেন, না হয় আসিয়া ফিরাইয়া দিবেন। জানেনই ত আপনাদের বাড়ীতে বহুজীর (বিমাতার) আজ্ঞাই প্রতিপালিত হয়। যদি আপনার কিছু ব্যয় করিবার আবশ্যক হয়, আর উনি যদি না দেন তখন আপনি কি করিবেন?” বালক ভারতেন্দু ধূর্ত্তের ধূর্ত্ততা-জালে জড়িত হইলেন, মোহর দুটী গ্রহণ করিলেন। একজন সমবয়স্ক ব্রাহ্মণযুবক তাঁহাদের সঙ্গে যাইতেছিলেন, তিনিই খাজাঞ্চি বা “ক্যাসিয়ার” হইলেন। ঋণ গ্রহণের অভ্যাস এই স্থান হইতে আরম্ভ হইল।

হাতে টাকা থাকিলেই মানুষের মেজাজ গরম হয়, ইঁহারও হইল। রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলে যাওয়া হয়, পরে পাল্কী ও গোশকটের ব্যবস্থা হইল। বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত গিয়া কোন কারণে ইঁহার বিমাতার সহিত মতানৈক্য হয়। ইনি বলিলেন, “আমি বাড়ী ফিরিয়া যাইব।” কিন্তু সহযাত্রিবর্গ ইঁহার কথা গ্রাহ্য করিলেন না, সকলে জানিতেন, উঁহার কাছে একটা পয়সাও নাই, বাড়ী যাইবেন কিরূপে? এদিকে ইনি ক্যাসিয়ারকে সঙ্গে লইয়া বাজারে একটী মোহর ভাঙ্গাইলেন এবং ষ্টেশনে আসিলেন। যখন এই সংবাদ ইঁহার কনিষ্ঠ সহোদর গোকুলচন্দ্রের কর্ণগোচর হইল, তিনি সজল নেত্রে জ্যেষ্ঠকে ফিরাইয়া আনিতে গেলেন। ভ্রাতৃস্নেহের অনুরোধে ভারতেন্দু ফিরিলেন বটে, কিন্তু সে অবধি যে ইঁহার প্রকৃতিতে স্বতন্ত্রতার স্রোত প্রবাহিত হইল তাহা আর ফিরিল না। ক্রমে ক্রমে মোহর দুইটী ব্যয় হইয়া গেল, এবং সেই হইতে ঋণ গ্রহণের সাহস বাড়িল। এই কুঅভ্যাসের জন্যও সেই স্বর্ণমুদ্রা দুইটী উপলক্ষ করিয়া ইঁহার কাশীস্থ একটী প্রাসাদ-তুল্য ভদ্রাসন—যাহার মূল্য পঞ্চদশ সহস্রের ন্যূন হইবে না—উক্ত শুভাকাঙ্ক্ষী মোহরদাতার হস্তগত হয়।

এই সময় ইঁহার রুচি গদ্যপদ্যময় কবিতার অনুরাগী হয়। তিনি “প্রবাস নাটক” নামক একখানি নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু সেখানা অসম্পূর্ণ ও অপ্রকাশিত রহিয়া যায়। এই সময় ইনি বঙ্গভাষা শিক্ষা করেন। অল্প দিনের মধ্যে ইঁহার মন দেশহিত-কর কার্য্যের দিকে অগ্রসর হইল। তখন বুঝিতে পারিলেন, যে পাশ্চাত্য ভাষা শিক্ষা না করিলে এবং মাতৃভাষার উন্নতি না করিলে, দেশের মঙ্গল হইবে না। সে সময় কোন সাধারণ ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল না। গবর্ণমেণ্ট বা মিশন স্কুলে অধ্যয়ন করা ব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া সাধারণের ইংরাজী পড়িবার সুবিধা হইত না। এই অভাব দূরীকরণার্থ ইঁহারা উভয় ভ্রাতা মিলিয়া নিজ বাটীতে কয়েকটী বালককে ইংরাজী শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। বলা বাহুল্য, যে পড়িবার জন্য বালকদিগকে কিছু মাহিনা দিতে হইত না, অধিকন্তু উহারা শ্লেট, পেন্সিল ইত্যাদি বিনামূল্যে পাইত। ক্রমে ছাত্র সংখ্যা যেরূপ বাড়িতে লাগিল, ইঁহাদের উৎসাহও সেইরূপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এক জন অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইল। উত্তরোত্তর ছাত্র সংখ্যা অধিক হওয়ায় “চৌখম্বা স্কুল” নামক বিদ্যালয় নিয়মিতরূপে স্থাপিত করিলেন। উহাতে অধিকাংশ বালক বিনা বেতনে পড়িতে পাইত, পুস্তকাদিও বিনামূল্যে পাইত। অনাথ বালকদিগকে আহার ও পরিচ্ছদ দেওয়া হইত। এই বিদ্যালয় দ্বারা সে সময় কাশীতে ইংরাজী শিক্ষার আশাতীত উপকার হয়। এতদ্ব্যতীত ইনি কাশীর “জয়নারায়ণ স্কুল” এবং “কুইন্স কলেজের” ছাত্রদিগের পারিতোষিক দিবার সময় পুস্তক, ঘড়ী ও নগদ অর্থ দিয়া বালকদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন।

মাতৃভাষার প্রতি প্রেম ও কবিতার প্রতি অনুরাগ বাল্যাবস্থা হইতেই ইঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, কিন্তু এই সময়ই তাহা পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়।

১১৬৮ খৃষ্টাব্দে “কবি-বচন-সুধা” নামক মাসিক পত্র প্রকাশিত করেন। প্রাচীন হিন্দী কবিদিগের কবিতা-গুলি প্রচার করাই “কবি-বচন-সুধা”র মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। পরে যখন বুঝিলেন, যে গদ্য রচনার বহুল

প্রচার না করিলে কিছু উপকার হইবে না, তখন "কবি-বচন-সুধা"কে পাক্ষিকও পরে সাপ্তাহিক করিয়া তাহাতে রাজনৈতিক এবং সমাজনৈতিক আলোচনাদি করিতে আরম্ভ করিলেন। কোন কোন কারণে ইঁহাকে পুরাতন সমাজের পক্ষপাতীদিগের বিরাগভাজন হইতে হয় এবং কয়েকটী কারণে নব্য সম্প্রদায়ও ইঁহার উপর অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু ইনি কাহারও মতামতের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করিতেন না, যাহা নিজ মনে ভাল বুঝিতেন তাহাই করিতেন, আজন্ম তাহাই করিয়া গিয়াছেন।

যে সময়কার কথা বলা হইতেছে সে সময় হিন্দী সাহিত্যের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। তখন মূল্য দিয়া পুস্তক বা সংবাদ পত্র ক্রয় করিয়া পাঠ করেন, এরূপ পাঠক হিন্দী সাহিত্য-সমাজে একজনও ছিলেন না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভারতেন্দুর নিজ ধনসম্পত্তির উপর বিন্দুমাত্রও মমতা ছিল না। নানাবিধ পুস্তক অতি উত্তমরূপে মুদ্রিত করিয়া স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করিয়া হিন্দীর পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেন। তিনি কিরূপ অসাধারণ মাতৃভাষা ও স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন, তাহা এই ঘটনাতে সহজেই অনুমান করা যায়। এইরূপ বিদ্যা প্রচারের জন্য তিনি প্রায় লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় করেন।

এই সময় অনরেরি ম্যাজিষ্ট্রেটী পদ প্রবর্ত্তিত হয়। ভারতেন্দু মহাশয়কে গবর্ণমেণ্ট উক্ত পদে নিযুক্ত করেন। পরে তিনি মিউনিসিপাল কমিশনর নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা ইঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন, কিন্তু সে জন্য ইনি তাঁহাদের কাহারও প্রকৃত দোষ বলিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। এই সময় স্বর্গীয়া মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্র "ডিউক অব্ এলেনবরা" ভারত সন্দর্শনার্থ শুভাগমন করেন। কাশীতে তাঁহার জন্য যে মহোৎসব হয়, ভারতেন্দুই তাহার প্রধান উদ্যোগী হন। সে সময় নিজ আবাস-ভবন তিনি এরূপ সুসজ্জিত করিয়াছিলেন, যে তাহার সৌন্দর্য্যাবলোকন করিয়া স্বয়ং ডিউক মহোদয়ও তাঁহার প্রশংসা করেন। কুমারকে নগর পরিদর্শন করাইবার ভারও ভারতেন্দুর উপর ন্যস্ত হয়। ইঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব এই ছিল, যে ইনি নিজে সম্মানিত হওয়া অপেক্ষা অপর যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মানিত হইতে দেখিলে অধিক সুখী হইতেন। এই সময় ইনি গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহভাজন ছিলেন, ইঁহার প্রকাশিত "কবি-বচন-সুধা", "বালা-বোধিনী", "হরিশ্চন্দ্র চন্দ্রিকা" এই মাসিক পত্রিকা ত্রয় এক শত খানি করিয়া শিক্ষা-বিভাগ ক্রয় করিতেন। এই সময় ইনি পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হন।

ইঁহার "কবি-বচন-সুধা"র আদর যে কেবল এদেশেই হইয়াছিল এমত নহে, ইউরোপেও তাহার আদর হয়। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ বিদ্বান "গার্সন দি তাসি" নিজ বিখ্যাত পত্র "লি লেঙ্গুয়া ডেস হিন্দুস্থানীসে" মুক্ত-কণ্ঠে এই পত্রিকার ও প্রকাশকের প্রশংসা করেন।

মাতৃভাষাভক্ত ভারতেন্দু কেবল "কবি-বচন-সুধা" প্রকাশিত করিয়া সন্তোষ লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি "হরিশ্চন্দ্র ম্যাগাজিন" নামে আর একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু উক্ত নামে ইহার মাত্র পাঁচ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। পরে ইহাই "হরিশ্চন্দ্র চন্দ্রিকা" রূপে প্রকাশিত হয়। ইঁহার দ্বারা উৎসাহিত হইয়া অনেকে হিন্দীর সুলেখকগণের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। তাঁহাদের সে সময়কার লেখাগুলি এখনও লোকে আগ্রহ সহকারে পাঠ করে। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে "বালা-বোধিনী" প্রকাশিত হয়। স্ত্রীশিক্ষাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

ভারতেন্দুই হিন্দী ভাষার যুগান্তর উপস্থিত করেন। ইনি "পেনি রিডিং" নামক একটী সমাজ স্থাপিত করেন, তাহাতে লেখকেরা যে কোন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করিতেন। এই সময় ইঁহার "কর্পূর মঞ্জরী", "সত্য হরিশ্চন্দ্র" ও "চন্দ্রাবলী" এই নাটকত্রয় প্রকাশিত হয়। স্বলিখিত পুস্তকাপেক্ষা অপরের পুস্তকের উপর ইঁহার অধিক মমতা ছিল।

হিন্দীর অনেকগুলি প্রাচীন ও নবীন গ্রন্থ ইঁহার ব্যয়ে মুদ্রিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হয়। যদিও হিন্দী এখন বাঙ্গালা, মারাঠী, গুজরাটী ইত্যাদির ন্যায় উন্নতি করিতে পারে নাই, তথাপি ইহার যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহার মূল কারণ ভারতেন্দুকেই বলিতে হইবে।

১৪১ ১৪১

তিনি যদি নিঃস্বার্থ হৃদয়ে হিন্দীর উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর না হইতেন, তাহা হইলে ইহার এতটুকু উন্নতিও বোধ হয় হইত না। (ক্রমশঃ)

প্রবাসিনী।*

কোহেবালের কামিনী।

ভারতবর্ষ মহাদেশের পশ্চিমোত্তর সীমার সমীপবর্ত্তী যে সুবিস্তৃত মুশলমানপ্রধান প্রদেশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার আধুনিক ভৌগলিক নাম আফগানিস্থান। অতি প্রাচীন কালে এখানে মুশলমান ধর্ম্মের বিন্দুমাত্রও প্রভাব বর্ত্তমান ছিল না; তখন মহম্মদের জন্ম বা ইশলাম ধর্ম্মের উৎপত্তি হয় নাই। এই পুরাতন প্রদেশ, পৌত্তলিক হিন্দুপুঞ্জে পরিপূর্ণ ছিল; মহাভারতে ইহার নাম অবসাদ রাজ্য অথবা অবসাদ কঞ্চ; কঞ্চ শব্দের অর্থ গিরি (পর্ব্বত)। রঘুরাজা যখন দিগ্বিজয় করিতে এতদ্দেশে গমন করিয়া ছিলেন তখনও এখানে মুশলমান ছিল না; কবিবর কালিদাস তাঁহার ভুবনবিখ্যাত রঘুবংশ কাব্যে আফ্গানিস্থানকে হিন্দু-দেশ বলিয়াই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এক সময়ে এখানে বহুসংখ্যক রোমান কাথলিক খৃষ্টান বাস করিত, ক্রমে সমুদয় "অবসাদরাজ্য" মুসলমান প্রজায় পরিপূর্ণ হইলে ইহা "কোহেবাল" নামে প্রখ্যাত হইয়া উঠে। কোহেবাল শব্দের অপভ্রংশ কাবুল; কোহে শব্দের অর্থ পর্ব্বত; বাল শব্দের অর্থ মালা— An undetached range of mountains. এক্ষণে এদেশের রাজধানীকে কাবুল কহা হইয়া থাকে, সমগ্র দেশকে কোহেবাল বা কাবুল না কহিয়া আফগানিস্থান (অথবা আফগান ভূম) কহা হইয়া থাকে। এখানকার রাজা মুশলমান, প্রজা মুশলমান এবং সমগ্র দেশবাসীরা সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত আফগান বলিয়া পরিচিত। কিন্তু সেই প্রাচীন কালের প্রথা অনুসারে এখনও আফগানিস্থানের লোকেরা পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র "কাবেলী" (কাবুলে) বলিয়া সম্বোধিত হইয়া থাকে।

আফগান ভূমে ভ্রমণ করিলে স্থানে স্থানে হিন্দুর দর্শন পাওয়া যায়। কান্দাহার নগরে হিন্দুর সংখ্যা অন্যান্য স্থানাপেক্ষা তুলনায় অধিক। এই কান্দাহারই হিন্দু পুরাণোক্ত গান্ধার নগর। দুর্য্যোধনের জননী (অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী) রাণী গান্ধারী, গান্ধার রাজার কন্যা ছিলেন। পূর্ব্বকালে এদেশের মুশলমানেরা সুবিধা পাইলে হিন্দুর উপর অত্যাচার ও অবিচার করিতে বিস্মৃত হইত না, কিন্তু পঞ্জাবকেশরী মহাবলী রাজা রণজিৎ সিংহ বাহাদুরের সময় হইতে হিন্দুর উপরে মুশলমানদিগের অত্যাচার লোপ পাইয়াছে। রাজা রণজিতের প্রধান সেনাপতি সুপ্রসিদ্ধ বীর হরিসিংহ আফগানদিগকে এমন দমিত ও শাসিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, শিখ সৈন্যের সহায়তায় পাঠানেরা এরূপ ভয়ানক রূপে দণ্ডিত ও নির্য্যাতিত হইয়াছিল যে, এখনও সে দেশে ছোট ছোট পাঠান বালক বালিকারা হরিসিংহের নামে ভয়ে কাঁপিয়া থাকে। যাহা হউক, ইংরাজদিগের সংশ্রবে আসিয়া আফগানদিগের অসভ্যতা কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং অনেক শিক্ষিত ও প্রতিভাশালী হিন্দু আফগানিস্থানের আমীরের অধীনে প্রধান প্রধান রাজকীয় পদে নিযুক্ত আছেন।

ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, এক সময়ে সমগ্র আফগান ভূম হিন্দু প্রজা ও হিন্দু দেবদেবীর মন্দিরে পরিপূর্ণ ছিল। তখন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী রাজা এখানে রাজত্ব করিতেন। প্রজারা শৈব ও সৌর এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। মাটীর নীচে এখনও অনেক প্রাচীন হিন্দু-কীর্ত্তি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। রাজা রণজিৎ সিংহ যে সময়ে কাবুল জয় করেন সে সময়েও সহস্র সহস্র হিন্দু এদেশে বাস করিত; ইংরাজেরা সর্ব্ব প্রথমে এ দেশে আগমন করিবার সময় আফগান ভূমে বহু হিন্দু দর্শন করিয়াছিলেন। রোমান কাথলিক পাদ্রীরা কোহেবাল দেশে আসিয়া যাহাদিগকে খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহাদের অধিকাংশ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এখন এ দেশে হিন্দুর

---

* আমাদের এই মাননীয়া লেখিকা যুক্ত-প্রদেশ-প্রবাসিনী জনৈক বঙ্গনারী। ঐ প্রদেশে বাস করিয়া তিনি হিন্দী ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন; হিন্দী পত্রিকাদিতে তাঁহার প্রবন্ধাদি সাদরে প্রকাশিত হইয়া থাকে। একজন বঙ্গনারীর এই প্রকার জ্ঞানস্পৃহা আমাদের গৌরবের বিষয়। ভাঃ মঃ সঃ।

সংখ্যা নগণ্য; হিন্দু অপেক্ষা বরং শিখের সংখ্যা অধিক। আফগান দেশে আফ্রিদি নামে এক প্রাচীন জাতি বাস করিত, ইহাদের বালক বালিকাগণকে দেখিলে ঋষিকুমার ও ঋষিকুমারী বলিয়া ভ্রম হয়। আফ্রিদিরা তদ্দেশীয় প্রাচীন হিন্দুদিগের বংশধর ছিল। ইহাদের অধিকাংশ শৈব মতাবলম্বী এবং মুনির ন্যায় মূর্ত্তিধারী ছিল। প্রায় ত্রিংশবর্ষ অতীত হইল, খৃষ্টীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে কাবুলের আমীর ঐ জাতিকে অন্যায় বলপ্রয়োগ ও নির্য্যাতন দ্বারা মুশলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। এখন সমগ্র আফ্গানিস্থান মুশলমানে পরিপূর্ণ; তথায় প্রাচীন খৃষ্টানের চিহ্ন মাত্র বর্ত্তমান নাই।

'কাবুল' ও 'আফ্গান' এই দুই শব্দ লইয়া অনেকে অনেক প্রকার ভ্রমাত্মিকা আলোচনা করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ অনেকে এই দুই প্রয়োজনীয় শব্দের অর্থ জানেন না, এই জন্য এবিষয়ে যথাকথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া পাঠকপাঠিকার বহুদিনের একটী ভ্রম অপনোদন করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। আফগানিস্থানের ভাষার নাম পশ্‌তু, এই ভাষায় আফ্‌গান শব্দের অর্থ "সুন্দর-কায়।" বাস্তবিক আফগান ভুমে গিয়া আফগানিস্থানবাসী-দিগকে দেখিলে সুন্দরকায় বলিতেই ইচ্ছা হয়। উন্নত ললাট, শালপ্রাংশু বাহু, সদ্যফুল্ল কমলতুল্য লোচন, গোলাপ প্রসূন-বর্ণবিশিষ্ট উন্নত কপোল, বিস্ফুরিত ভ্রূযুগল, প্রশস্ত বক্ষ, ত্রিবলী সমন্বিত কটি এবং সুঠাম ও সুন্দর শরীর দেখিয়া কোন্ ব্যক্তি এই দেশের স্ত্রীলোক ও পুরুষকে সুন্দরী ও সুন্দর কহিতে ইচ্ছা না করে? পশ্‌তু ভাষায় "আফগা" নামে একটা শব্দ আছে, তাহার অর্থ শৈত্য; আফগা ধরিয়া অর্থ করিলে আফগান শব্দের 'শীতল দেশবাসী' অথবা 'শীতভোগী' এই রূপ অর্থ হয়, কিন্তু আমার বিবেচনায় আফ্‌গা অর্থে সুন্দর ইহাই ঐ শব্দের প্রকৃত অর্থ।

"কাবুল" শব্দ পৃথিবীর অনেক ভাষায় অনেক অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। বাইবেলের পুরাতন টেষ্টা-মেণ্ট গ্রন্থে, য়িহুদীদিগের হিব্রু (অথবা ইব্রীয়) ভাষায় কাবুল অর্থে অপরিষ্কার বা অপরিচ্ছন্ন বুঝায়। পারস্য ভাষায় 'কবল' অর্থে পূর্ব্ব (কিন্তু এই অর্থের সহিত কাবুল শব্দের কোন সংশ্রব নাই।) পারস্য ভাষায় 'কাবেল' অর্থে পারদর্শী বা যোগ্য। গ্রীক ভাষায় কাবোলশ শব্দের অর্থ মেথর (অথবা আবর্জ্জনা পরিষ্কার-কারী ব্যক্তি।) ইটালী ভাষায় কাবীল শব্দের অর্থ ভাস্কর। যাহা হউক, পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, প্রাচীন কালে সমগ্র আফগান ভুম "কোহেবাল" নামে আখ্যাত ছিল; বর্ত্তমান সময়ে উহার রাজধানী মাত্র কাবুল নামে পরিচিত, সমগ্র দেশ আফগানিস্থান নামে প্রখ্যাত। কাবুল শব্দ কোহেবাল শব্দের অপভ্রংশ অর্থাৎ পর্ব্বত-মালার দেশ।

পাঠক পাঠিকারা অবগত আছেন, পৃথিবীর কোন মুশলমান রাজ্যে কখন মুশলমান স্ত্রীলোকেরা স্বাধীনতা বা সুশিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন না। মুশলমান-সন্তান চিরকালই স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার বিষম বিরোধী, কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে যাঁহারা কোরাণ সরিফ এবং হদিশ্‌ সরিফ্‌ পাঠ করিয়া তাহার সদর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অবশ্যই বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে, মুশলমান শাস্ত্র ও মুশলমান সাহিত্য স্ত্রীশিক্ষার আদৌ বিরোধী নহে, এবং স্ত্রী-স্বাধীনতার সম্পূর্ণভাবে প্রশ্রয় না দিলেও স্ত্রীকুলকে একেবারে পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিনী সমতুল্যা করিয়া রাখিবার আদেশ দেন নাই। যাহা হউক, মুশলমানেরা এই দুই বিষয়ে তাঁহাদের শাস্ত্র ও শাস্ত্রকর্ত্তাদিগকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া আসিতে-ছেন। পারস্যদেশের ভুবনবিখ্যাত কবি এবং অত্যুচ্চ সাধক মোলানা সেখ্‌ সাদি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "গোলেস্তাঁ।" নামক কাব্যে লিখিয়াছেন ঃ—

"রাহে রাস্‌ৎ বেরো
অগরচে দুরশ্‌ৎ।
জন্‌-এ বেওয়া মকুণ্‌
অগরচে হুরস্‌ৎ।"

ইহার অর্থ এই ঃ—"সোজা পথ দুরবর্ত্তী হইলেও সেই পথে চলিবে এবং পরীর ন্যায় সুন্দরী রমণী হইলেও বুদ্ধিহীনা মূর্খাকে বিবাহ করিবে না।" অনেকে বলেন, উপরি উক্ত শ্লোকস্থ "বেওয়া" শব্দের অর্থ বিধবা; তাহা কেমনে হইতে পারে? মুশলমান শাস্ত্র বিধবা বিবাহের বিরোধী

নহে, সুতরাং এই শ্লোকে বেওয়া অর্থে বিধবা নহে। যাহা হউক, পৃথিবীর সর্ব্বত্র মুশলমানের নারী-সমাজ ঘোরতর অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও পরাধীনতায় সমাচ্ছন্ন। রমণীদিগকে তাঁহারা এমন পর্দ্দানশিনী করিয়া রাখিয়াছেন, যে অনেক স্থানে পথের ভিখারিণীরা পর্য্যন্ত মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ "বুর্খা" পরিয়া পথ চলে, কেবল বুর্খার ছুইটা ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া চক্ষুর সাহায্যে পৃথিবীকে দেখিতে পায়। ভারতবর্ষে রমণীর উপর মুশলমানেরা অত্যাচার না করিলে এদেশে বোধ হয় এতদূর পর্দ্দা-প্রথার সৃষ্টি হইত না। যাহা হউক, এবম্বিধ নানা কারণে মুশলমান-দিগের নারী-সমাজ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করা বিষম কষ্টকর ব্যাপার বলিয়া গণ্য করিতে হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আফগানিস্থানের রমণীগণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; আমি এই প্রবন্ধে শোনাকথা বা কেতাবের কথা আদৌ গ্রহণ করি নাই; আফগান প্রদেশে স্বয়ং ভ্রমণ করিতে করিতে কতিপয় বর্ষকাল পূর্ব্বে যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম ও নিজের চেষ্টায় যাহা জানিতে সক্ষম হইয়াছিলাম, তাহাই এস্থলে লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম। আশিয়া মহাদেশে আফগান-রমণী এক অত্যদ্ভুত পদার্থ, ইহাদের বিবরণ পাঠ করিতে করিতে অনেকে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতে পারেন। আমি যখন পেশোয়ার হইতে আফগান-স্থানাভিমুখে পদ-ব্রজে (এবং কখন কখন উষ্ট্র পৃষ্ঠে) ফকির, সন্ন্যাসী, পথিক ও আফগান-বণিক (Caravan) সঙ্গে অতি কষ্টে গমন করিয়াছিলাম, তখন এই সুবিস্তৃত পথমধ্যে একটিও আফগান রমণীকে দেখিতে পাই নাই; আফগানিস্থানের সীমায় যখন সর্ব্বপ্রথম আফগান রমণীকে দেখিলাম, তখন বোধ হইল, যেন বজ্রাদপি কঠোরতা এবং কুসুমাদপি কোমলতা একত্রে মিলিয়া ঐ রমণীতে উজ্জ্বলে মধুরে মিশিয়াছে। বলা বাহুল্য, হিন্দুস্থান প্রভৃতি দূরবর্ত্তী দেশে আফগান রমণীরা প্রায়ই স্বদেশ হইতে আনীতা হয় না; আনীতা হইলে তাহাদের কোমলতা ও মধুরতার অংশ উড়িয়া গিয়া কেবল তীব্রতা ও কঠোরতার ভাগ-টুকু থাকিয়া যায়। পাঠক পাঠিকা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, অল্প দিন পূর্ব্বে কলিকাতার পুলীশ মাজিষ্ট্রেট্ মিষ্টার রাম অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ বাহাদুরের এজলাসে এই বলিয়া কলিকাতা প্রবাসিনী একজন কাবুলী রমণীর নামে মোকদ্দমা হইয়াছিল যে, মিউনিসিপালিটীর বড় বেতনের একজন সুপারভাইজার বাবুকে বিবি সাহেবা সম্মার্জ্জনী হস্তে এমন প্রহার করিয়াছে যে, বাবু ভায়া কাঁদিতে কাঁদিতে পলাইয়া আসিয়া পুলিস প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। মোকদ্দমা এখনও শেষ হয় নাই।

প্রস্তাবের দীর্ঘতা আশঙ্কায় এবারে এই খানেই লেখনীকে বিরাম দিয়া বারান্তরে কোহেবালের কামিনীর বৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইব। এবারে ভূমিকা মাত্র লিখিত হইল। (ক্রমশঃ)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

কল্যাণী।

১

আর বাকি নাই রাতি।
পূরব গগনে উঠেছে জাগিয়া
তরুণ অরুণ ভাতি।
স্নান সমাপন করিয়া কখন
পরেছ পট্টবাস,
পৃষ্ঠ উপরে লুটিছে মুক্ত
সিক্ত চিকুর পাশ।
আসি উপবনে একাকিনী তুমি
তুলিছ ভরিয়া সাজি
শিবপূজা তরে শিশির-স্নিগ্ধ
শুভ্র কুসুমরাজি!

২

গগনে বাড়িল বেলা।
নাহিক তোমার পুণ্য কর্ম্মে
ক্ষণেকের তরে হেলা।

১৪৪(A)

সীতা ও মায়ামৃগ।

১৪৪(A)

তুমি দাও আনি যত পরিজনে
আপনার হাতে করে'
ক্ষুধার অন্ন পিপাসার বারি
কত-না যতন ভরে।
তাপিত ধরণী, অয়ি সেবাময়ি,
তোমার বিরাম নাহি,—
ভাণ্ডার খুলি আছ গৃহহারা
অতিথির পথ চাহি'।

৩

দিন হয়ে এল শেষ।
ম্লান হয়ে এল গোধূলি আলোক
আঁধারে ঘিরিল দেশ।
মঙ্গল করে, গৃহ দীপ খানি
জ্বালি' এ শান্ত সাঁঝে,
সন্ধ্যা আরতি করি সমাপন
দাঁড়ায়েছ গৃহমাঝে।
হাটে মাঠে যারা ছিল ফিরে' এল
আরতি শঙ্খ রবে,
আশ্রয়ে তব লভে বিশ্রাম
পান্থ যে জন ভবে।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

পরিবর্ত্তন।

১

বিনোদবিহারী মিত্র অভিমান বশতঃ শ্বশুরালয় হইতে চলিয়া আসিয়াছে, সঙ্গে কিশোরী স্ত্রী ও শিশু কন্যা। কলিকাতায় একটি ক্ষুদ্র চালাঘর ভাড়া করিয়া, মাসাবধি তথায় বাস করিয়াও কোন প্রকার চাকরীর সুবিধা করিতে পারিল না। সঙ্গে যাহা কিছু অর্থ ছিল তাহা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, বসন ছিন্ন, ধূলিপূর্ণ এবং দেহ রুক্ষ হইয়াছে। বিনোদবিহারী বড় আশা করিয়াছিল, কলিকাতা এত বড় সহর, কোন না কোন প্রকার সুবিধা অবশ্যই হইবে। কিন্তু কোন প্রকার সুবিধা করিতে পারিল না। কত ... কত সংবাদ পত্রের আফিসে ঘুরিয়া আসিল, ... সের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কেহই তাহাকে ডা... কোন কথা জিজ্ঞাসা করে না। অধিকন্তু কাজের কথা বলিলে সার্টিফিকেট চায়, কোন বড় লোকের পত্র চায়, সে তাহা কোথায় পাইবে? আর সে এসকল কার্য্যের উপযুক্তও হয় নাই।

বিনোদবিহারী শৈশবে পিতৃহীন হইয়াছিল, তাহার মাতা তাহাকে লইয়া তাহাদের পৈতৃক গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার সামান্য একখানি মৃন্ময় গৃহ ছিল, স্বামীর জমিজমা ছিল, তাহাই প্রজাদের দিয়া তাহার যৎসামান্য আয়ে, সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতেন, অর্থাৎ পরানুগ্রহে বা পরপ্রত্যাশী হইয়া থাকিতে হইত না। যখন বিনোদ ষোড়শবর্ষীয় বালক তখন তিনি গ্রামের লোকের সহিত তীর্থ করিতে যান, পথেই তাঁহার দারুণ পীড়া হয়, তাঁহার সহযাত্রীরা তাঁহাকে সেই অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। বিনোদের মাতা তাঁহার একজন অপরিচিত সহযাত্রী ব্রাহ্মণের হস্তে পুত্রটিকে সমর্পণ করিয়া, সেই যাত্রাতেই ইহলোকের লীলা সমাপ্ত করিয়া চলিয়া যান। সেই সহযাত্রী ব্রাহ্মণ আপনার বাসস্থান মেদিনীপুরে চলিয়া আসেন। তাঁহার অবস্থা স্বচ্ছল ছিল, কোন প্রকার কষ্ট ছিল না, তিনি দরিদ্র বালকটির প্রতি মমতাপরবশ হইয়া তাহাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। এক বৎসর গত হইতে না হইতে সেই ব্রাহ্মণের পরিচিত কন্যাদায়-গ্রস্ত বন্ধু গিরিশচন্দ্র বসু বিনোদবিহারীর হস্তে আপনার কন্যাটিকে সমর্পণ করিয়া কন্যাদায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। তাঁহার লাভ হইল, যে কন্যাকে কিছু অলঙ্কার পত্র বা বহুমূল্য বরাভরণ দিতে হইল না; লোকসান হইল, একটি মূর্খ জামাতা আসিয়া স্কন্ধে আরোহণ করিল।

নূতন নূতন জামাতার খুবই আদর আহ্লাদ হইতে লাগিল, গৃহস্থের ঘরের ভাল দুধটুকু, মাছখানি, মিষ্টান্নটি জামাতা বাবাজী ভোগ করিলেন। এইরূপে বিনোদ-বিহারীর ভোগ করিবার শক্তি যথেষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু

...। কিছুই ছিল না। বিনোদের ... সরকারী আফিসে সামান্য একটি কাজ ...তেন, তাঁহার আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক ছিল, সংসারে টানাটানি উপস্থিত হইয়াছিল। জামাতা বাবাজাকে কোনও কার্য্যে প্রবেশ করাইবার তাহার অত্যন্ত ইচ্ছা, কিন্তু যে কোন কার্য্যে বিনোদ প্রবেশ করিত, অক্ষমতার জন্য দু চার দিন বাদে তাহাতেই ইস্তফা দিয়া আসিতে হইত। গিরিশ বসুর বড় জামাতাটি হাকিম, সেজন্য এই মূর্খ অক্ষম জামাতার প্রতি ক্রমে তাঁহার বিরূপ ভাব উপস্থিত হইতে লাগিল।

এই প্রকারে চারি বৎসর অতীত হইয়া গেল, বিনোদের স্ত্রী সুখদার একটি সন্তান হইয়া অকালে চলিয়া গেল। তাহার পর বৎসরান্তে একটি শিশু কন্যা আসিয়া তাহার দগ্ধ হৃদয়কে জুড়াইয়া শান্তি প্রদান করিল। সুখদা তাহার অদৃষ্টে কোন প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করিত না। বিনোদ মূর্খ হউক, অক্ষম হউক, সুখদাকে ভালবাসিত, তাহা সুখদা বেশ জানিত, তাই যখনি কেহ তাহার মূর্খ স্বামীকে উপহাস করিয়া কিছু বলিত বা অবজ্ঞা প্রকাশ করিত, তখনি তাহার দুই চক্ষে অশ্রু ভরিয়া উঠিত। বাটীর অন্যান্য সকলে একত্রিত হইলেই বিনোদের গুণের সমালোচনা করিত, অকর্ম্মণ্যতার জন্য ঘৃণা প্রকাশ করিত, সে তাহা শুনিলে নীরবে সে স্থান হইতে উঠিয়া যাইত, সকলি সহিয়া থাকিত। সে স্বামীর নিকট পর্য্যন্ত কিছু ফুটিয়া বলিত না। সে শুধু জগদীশ্বরের নিকট গোপনে প্রার্থনা করিত, এক মনে শিবপূজা করিত, আর নমস্কার করিবার সময় তাহার চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইত। যখন শ্বশুরালয়ে বাস করা কঠিন হইয়া উঠিল, আহারের সময়ও নেপথ্য হইতে দু একটি শ্রুতি-সুখকর মধুর কথা উঠিতে লাগিল, তখন বিনোদের একটু ভাবিবার অবসর হইল। আর তাহার সারা দ্বিপ্রহর শুধু তাস খেলা ভাল লাগে না, আর বোসেদের বাটীর গান বাজনায় মন উঠে না, তাহার সেই আজন্মের গৃহ, সেই জন্মভূমি, সেই মায়ের স্নেহের জন্য মন চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু হায়, সে জননী কোথায়, সে গৃহে বন্ধন কই? এই ভাবিয়া সে তাহার নিজের অবস্থা নিজে বিস্মৃত হইত।

একদা রাত্রিকালে সহসা তাহার শিশুকন্যা পীড়িত হইল। সুখদা তাড়াতাড়ি নিদ্রিত স্বামীকে উঠাইয়া বলিল :—

"ওগো ওঠ, দেখ দেখ, আমার শৈল কি কচ্ছে!"

বিনোদ ভীতভাবে উঠিয়া বলিল, "কি করব?"

সুখদা বলিল, "বাবাকে মাকে ডাক, ওগো শীগ্‌গির ডাক"—

বিনোদ অস্থির ভাবে শ্বশুর মহাশয়ের গৃহদ্বারে করাঘাত করায় নিদ্রিত গিরিশচন্দ্র জাগরিত হইয়া বলিলেন,—"কে রে?"

বিনোদ সভয়ে বলিল, "আমি বিনোদ।"

গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "কেন, ব্যাপার কি?"

বিনোদ কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "শৈল—শৈলর অসুখ করেছে"—

গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "করেছে ত নিজে দেখ, ডাক্তার বৈদ্য আন, আমি কি করব?"

বিনোদের হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল, সে স্ত্রীর নিকট ফিরিয়া গিয়া দেখিল, শৈলবালা নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমাইতেছে, সুখদা চক্ষের জলে ভাসিতেছে। বিনোদ গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র, গিরিশচন্দ্র ও সুখদার মাতা সেই গৃহে আসিলেন। গিরিশচন্দ্র আসিয়া শৈলকে নিদ্রিত দেখিয়া বলিলেন, "এত রাত্রে কাণ্ড কি? কই মেয়ে ত বেশ ঘুমুচ্ছে, তবে অত চেঁচামেচি কেন? রাত্রে যেন ডাকাত পড়েছে। খেটে খেতে ত হয় না, দিব্যি তাস খেলে ইয়ারকি দিয়ে বেড়াও, রাত্রে জাগতে কষ্ট নাই, নিজে দুপুর বেলা ভর ঘুমিয়ে মজা করিও।"

গৃহিনী মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "সুখীর সকলই "সৃষ্টিছাড়া, দিন দিন কচিখুকী হচ্ছেন, চোকের জল ছাড়া কথা নাই। মরণ আর কি!"

তাঁহারা কক্ষান্তরে চলিয়া যাইবার পর সুখদা স্বামীর চরণে লুটাইয়া পড়িল, কাতরস্বরে বলিলঃ— "ওগো তোমার কি ভিটে নেই? সেখানে নিয়ে চল। সত্যি কি দুমুঠো ভাত জুটবে না?"

সুখদা আজন্ম পিতামাতার স্নেহে প্রতিপালিত হইয়াছে, কিন্তু স্বামীর অপমান আর তাহার সহ্য হয় না। তাই সকল কষ্ট মাথায় তুলিয়া সুখদা স্বামীর চরণে আশ্রয় চাহিল।

২

বিনোদ মধ্যে মধ্যে যখন কিছু কার্য্য করিত তাহাতে যাহা অর্থ পাইত তাহা সুখদাকে দিত, সুখদা তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। উভয়ে সেই সঞ্চিত অর্থের উপর নির্ভর করিয়া দেশে যাওয়া স্থির করিল। পরদিন প্রভাতে বিনোদ শ্বশুর মহাশয়ের নিকট গিয়া বলিলঃ—"আমি দেশে যাব।"

গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "আমি কি যেতে মানা করেছি?"

বিনোদ মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আমার স্ত্রীকেও নিয়ে যাব।"

গিরিশচন্দ্র রাগত হইয়া বলিলেন, "তা খেতে দেবে কি?"

বিনোদবিহারী এইবার দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "শাক ভাত যা জুটবে তাই দিব।"

গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "সুখী যায় ত নিয়ে যাও, আমার তাহাতে বাধা নাই।"

বিনোদ বলিল, "সে যাবে বলেছে।"

গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "বটে, সব ঠিকঠাক? আচ্ছা তোমার যবে খুসী হবে নিয়ে যাও, আমার কিছুমাত্র অমত নাই। তবে সাফ কথা বলছি বাপু, আমি গরিব মানুষ, মাসহারা দিতে পারব না।"

তাহার কিছুদিন পরে বিনোদবিহারী আপনার যৎকিঞ্চিৎ অর্থমাত্র সম্বল করিয়া মথুরাপুরী স্বরূপ শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিল। যাত্রাকালে শ্বশুর মহাশয়কে প্রণাম করিতে গেল, তিনি কোনও কথা কহিলেন না। যখন শ্বশ্রূমাতার চরণে প্রণাম করিল, তখন তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল, তিনি নীরবে দুই ফোঁটা অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিলেন। সুখদা যখন ম্লানমুখে মাতার চরণে প্রণাম করিল, তখন তাহার জননী উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন, "এমন সৃষ্টিছাড়া একরোকা ছেলের স... মেয়েটাকে জলে ভাসিয়ে দিয়েছে, ... নিয়ে যাবে, চাল চুলো আছে কি না কে ... মেয়ের আমার কি দশা হবে,"—ইত্যাদি। অবশেষে ... খানি পূজার বিল্বপত্র ও একটু সিন্দুর লইয়া সুখদার অঞ্চলে বাঁধিয়া দিলেন। সীমন্তে ও কপালে সিন্দুর-বিন্দু দিলেন। তাহার হস্তে পাঁচটি টাকা দিয়া বলিলেন, যদি জামাই বড় কষ্ট দেয়, যদি সেখানে থাকিবার না ইচ্ছা হয়, যেন গোপনে সুখদা সংবাদ দেয়। "কুপুত্র যদিচ হয় কুমাতা কখনও নয়" এপ্রবচনটিও একবার আবৃত্তি করিতে ভুলিলেন না।

বিনোদ কন্যা ও পত্নীকে লইয়া কলিকাতায় আগমন করিল। কলিকাতায় সেই বিপুল জনাকীর্ণ, সেই বাণিজ্য ব্যবসায়পূর্ণ সহর দেখিয়া তাহার হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। মনে করিল, এখানে কোন না কোন উপায় হইবে। সেই বহুদিন-পরিত্যক্ত, বিস্মৃত স্বদেশের প্রতি তাহার মন আকৃষ্ট হইল না। তাহার মন হইতে সেই ক্ষুদ্র গ্রামের স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া গেল, কলিকাতা থাকিবার বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল। সে ইচ্ছা দুদিনেই সমূলে বিনষ্ট হইবার উপক্রম দেখিয়া সে বড় ভাবনায় পড়িয়াছে। যাহার কাছে যায়, কেহই তাহাকে জানে না, চেনে না; সে জন্য সে কোন কর্ম্মেরই সুবিধা করিতে পারিল না। এদিকে তাহার সঞ্চিত অর্থ প্রায় ফুরাইয়া আসিল। সে অবশেষে একদিন হতাশ হইয়া সুখদাকে বলিল—"সুখী, তা হলে কি হবে? আর ত এই ৫টি টাকা বই কিছু নেই, কি করব?"

সুখী বলিল, "কেন, দেশে যাবে না? তুমি ত দেশে যাবার নাম করেই আমায় এনেছ, আমি ত আর কলিকাতায় থাকতে আসি নাই। তোমার বাপ পিতামহ যে দেশে ছিলেন, সেখানে চল। সেখানে গেলে তোমায় সবাই জানবে, তোমার কিছু না কিছু উপায় হবে।"

বিনোদ বলিল, "সে ত অনেক দূর। ষ্টীমারে যেতে হবে, তার ভাড়া চাই, হাতে যে টাকা আছে, তা থেকে বাড়ীভাড়া চুকিয়ে দিতে হবে।"

সুখী জিজ্ঞাসা করিল, "তা তোমার কত চাই?"

দশ টাকা না হলে কি করে

...ল, "তোমায় এত দিন বলি নাই, আসি-...নের মা আমায় পাঁচটি টাকা দিয়েছিলেন, আর তোমার পাঁচটি আছে, এই দশটি টাকায় ত সব হবে? আজই বাড়ীভাড়া চুকিয়ে দাও; কালই চল আমরা বেরিয়ে পড়ি, আর দেরি করে কি হবে?"

বিনোদ বলিল, "আচ্ছা তাই হবে, কিন্তু কাপড়ের যে দশা হয়েছে, দেশে গেলে ত একটু পরিষ্কার হয়ে যেতে হবে?"

সুখী বলিল, "তুমি আমায় এখনি একটু সাজিমাটি এনে দাও, আমি আজই সব ঠিক করে রাখব, তোমায় তার জন্য ভাবতে হবে না।"

বিনোদ ও সুখীতে মিলিয়া সমস্ত স্থির করিল ও তাহার পরদিন প্রত্যুষে ষ্টীমারে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

নব নারী।*

রাজপুত রমণী নারীকুলের অলঙ্কার স্বরূপ। রাজপুত রমণী একাধারে কুসুমের মত সুকোমল, বজ্রের ন্যায় কঠিন। অসংখ্য রাজপুত বীরনারী ভারতেতিহাস-কণ্ঠে কমনীয় রত্নমালার ন্যায় শোভা পাইতেছেন। এই সকল বীরনারীর আখ্যায়িকা পাঠে আমাদের হৃদয় প্রীতি ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, আমাদের প্রতীতি জন্মে যে, আত্ম নহে, পরিবার নহে, ধর্ম্ম এবং স্বদেশই তাঁহাদের জীবনের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য ছিল। ফলতঃ এই সকল বীরনারীর জীবনী পাঠ করিলে আমাদের প্রাণে স্বদেশপ্রেম জাগিয়া উঠে। আমরা ভারত-মহিলার পাঠক-পাঠিকাগণের জন্য কতিপয় রাজপুত বীরনারীর জীবনের পবিত্র কথা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

(১)

সিন্ধুরাণী।

৭১১ খৃষ্টাব্দে আরবগণ সিন্ধুবিজয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সিন্ধুদেশের অধিপতি রাজা দাহির আততায়ী মুসলমানের গতিরোধ করিবার জন্য জ্যেষ্ঠ রাজকুমারকে প্রেরণ করিলেন। আরব-সেনাপতি মোহাম্মদ কাশিম শৌর্য্যবীর্য্যের সাক্ষাৎ অবতার স্বরূপ ছিলেন। তিনি সিন্ধু-রাজকুমারের সমস্ত পরাক্রম অতিক্রম করিয়া রাজধানী আলোরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সিন্ধু-রাজ দাহির এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পঞ্চাশ হাজার সৈন্য সমভিব্যাহারে আরব-বাহিনীর সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। একটি গোলার আঘাতে রাজহস্তী আহত হইল; হস্তী যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে করিতে রাজাকে লইয়া রণক্ষেত্র হইতে দূরে পলায়ন করিল। রাজার তিরোধানে তদীয় সেনাবৃন্দ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। রাজ দাহির নিজেও আহত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহা তুচ্ছ করিয়া অবিলম্বে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইলেন, এবং পুনর্ব্বার প্রবলোৎসাহে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিজয়-শ্রী কিছুতেই তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন না, তিনি অসিহস্তে শত্রুনাশ করিতে করিতে রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন।

রাজার মৃত্যুর পর মোহাম্মদ কাশিমের সম্মুখে প্রবলতর বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল। বিধবা সিন্ধু-রাজমহিষী প্রচণ্ড তেজে কাশিমের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। তাঁহার আহ্বানে বিজিত সিন্ধুসেনাগণ পুনর্ব্বার সম্মিলিত হইল; তিনি শত্রুর হস্ত হইতে রাজধানী রক্ষার জন্য আয়োজন করিলেন। বীর-রমণীর অপূর্ব্ব বীরত্বে শত্রুর গতি প্রতিহত হইয়া পড়িল। মোহাম্মদ কাশিম অনন্যোপায় হইয়া নগর অবরোধ করিয়া রহিলেন। সিন্ধুর রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা হইয়াছিলেন। অচিরে নগর মধ্যে অন্নাভাব উপস্থিত হইল। কিন্তু বীর-রমণী এই ঘোর বিপদ কালেও আপন সংকল্পে অবিচলিত রহিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব বীরত্ব দর্শনে মুগ্ধ হইয়া

* Collected from 1. The Calcutta Review, 2. Todd's Rajsthan 3. Malleson's Native States of India. 3. Elphinstone's History of India &c.

রাজপুত সেনাবৃন্দও স্বজাতি-সুলভ অনুষ্ঠানে আত্ম-বিসর্জন করিতে প্রস্তুত হইলেন। নগরস্থিত রমণী ও বালক-বালিকাগণ স্বহস্তে চিতা সজ্জিত করিয়া জ্বলন্ত অগ্নিতে জীবনাহুতি প্রদান করিলেন। তার পর রাজপুত বীরগণ পবিত্র সলিলে অবগাহন ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন পুরঃসর পরস্পরের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। তখন নগরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল; রাজপুত বীরগণ অমিত পরাক্রমে শত্রুসৈন্য মধ্যে পতিত হইয়া তাহাদিগকে মথিত করিতে লাগিলেন; কিন্তু সংখ্যার অল্পতা নিবন্ধন একে একে শত্রুহস্তে পতিত হইয়া জীবন বিসর্জন করিলেন। সিন্ধুরাজ-মহিষী ও তাঁহার অনুবর্ত্তী রাজপুত বীরগণের আলোক-সামান্য বীরকীর্ত্তি চিরকালের জন্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইল।

(২)

কর্ম্মদেবী।

১১৯৩ খৃষ্টাব্দে দৃশদ্বতীর তীরবর্ত্তী বিশাল প্রান্তরে ঘোর-সেনাপতি সাহবুদ্দীনের হস্তে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন; পৃথ্বীরাজের ভগিনী-পতি ও অনুরক্ত সুহৃদ্ চিতোরের রাণা সমর সিংহ রণক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন; দিল্লীর দুর্গ-প্রাকারে মুসলমানের অর্দ্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইল। এই দুঃসংবাদ শ্রবণ করিয়া সমর সিংহের প্রিয়তমা মহিষী জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া পতির সহগমন করিলেন। দিল্লী নগরী অধিকার, সমর সিংহের দেহপাত, শ্রেষ্ঠ রাজপুতগণের মৃত্যু, —এই সকল ঘটনার পর রাজ্যের পর রাজ্য মুসল-মানের অধিকৃত হইতে লাগিল। সাহবুদ্দীনের সহকারী কুতবউদ্দীন সসৈন্যে চিতোরের দ্বারদেশে আগমন করিলেন। কিন্তু এই স্থানে বিজয়দৃপ্ত মুসলমান সৈন্যের অপ্রতিহত গতি বাধাপ্রাপ্ত হইল। এই সময় সমর-সিংহের অপরিণত বয়স্ক পুত্র কর্ণ চিতোরের সিংহাসনাধি-কারী ছিলেন। তদীয় মাতা বীর্য্যবতী কর্ম্মদেবী শত্রুর বিনাশ সাধন জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি নিজে সৈনাপত্য গ্রহণ করিয়া বিপুল রাজপুত-বাহিনীসহ শত্রুর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। অম্বরের নিকট উভয় সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। পরিশেষে বিজয়-শ্রী কর্ম্মদেবীর প্রতি প্রসন্ন হইলেন, কুতবউদ্দীন আহত ও পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। এই যুদ্ধকালে নয় জন করদ রাজা ও এগার জন সামন্ত রাণী কর্ম্মদেবীর সঙ্গী ছিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

সহানুভূতি।

শোন সখি—

ভ্রান্ত যদি একবার ভ্রমে যায় পড়ি,
সমাজ বারেক যদি না উঠায় ধরি',
নিতান্ত নিষ্ঠুর প্রায় আরো তারে ঠেলে দেয়,
তা'হলে তা'হলে তার কি হবে উপায়!
হায়রে, ভারত নারী এত অসহায়!
"মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" যে পথেতে অনুক্ষণ
সে পথে রমণী যদি একবার পড়ে,
একটু আশ্রয় নাহি মিলে তার তরে;
যদি সম বেদনায় গলি' ক্ষমা করুণায়
তাদেরে আশ্রয় দিত—বুঝাইয়া ভুল,
কত অভাগিনী তবে পেয়ে যেত কূল।
পুরুষ সহস্র বার যে পাপেতে অনিবার
নিমজ্জিয়া রহিয়াছে, হতেছে পঙ্কিল,
—তবু আছে তার তরে ক্ষমা অনাবিল—
সে পথে বিপাকে প'ড়ে, নারী যদি কভু পড়ে
কত যে লাঞ্ছনা পায় নিমেষ পতনে,
আরো তারা ভেসে যায় শ্লেষ উৎপীড়নে।
ভারতের শাস্ত্র বেদ কেমনে এমন ভেদ
রচিল?—কিরূপে, বল করিয়া বিচার—
যাতে রমণীর প্রতি হেন ব্যবহার!
এক দিনো যদি তারে, টানি আনি হাত ধরে'
পুণ্যের পবিত্র বায়ু করা'ত পরশ,
কত অভাগীর প্রাণ হইত সরস!

১৪৯

ভীষণ সংসার চক্র কত যে বিষম বক্র
কত মোহ প্রলোভন অবোধের তরে,
দিবা নিশি ঘিরে রাখে ঘন অন্ধকারে।
অন্ধ, দৃষ্টিহীন যারা কত অসহায় তারা
কত তারা বাধা পায় প্রতি পায় পায়
প্রতি দিন কত খেদে অশ্রু উথলয়।
তারা যদি ভ্রম বশে, পুণ্য হতে পড়ে খসে,
সমাজ কি একবার উঠাবে না ধরি'?
কাঁদিবে না একবার তার দশা হেরি?
তাহাদিগে সুধাইয়া বিচারের ভার নিয়া
শুনিবে না কিরূপেতে হইল পতিত,
ত্যজিয়া অমৃত হ'ল গরলে মজ্জিত?
হায়রে সরলা বালা বোঝে না সে ছল-কলা
শান্ত অন্তঃপুর হতে টেনে আনি দূরে,
শঠ শেষে ফেলে যায় অকূল প্রান্তরে।
তখন বিশাল ধরা রুদ্র রক্তাম্বর পরা
তার কাছে নিমেষেতে দেয় দরশন,
অভাগী সে কোথা বল করে পলায়ন?
প্রথম চরণ ক্ষেপে, ফিরিয়া দেখিল যবে,
দেখিল সে সমাজের রুদ্ধ সব দ্বার,
তার তরে এতটুকু পথ নাহি আর।
কম্পিতা শঙ্কিতা নারী আর নাহি পথ হেরি
বিপথেরে একমাত্র করি দরশন,
নিরুপায় হয়ে করে সে পথে গমন।
আপনার গৃহে হায় নরাধম ফিরে যায়,
তার তরে রুদ্ধ নহে সংসারের দ্বার;
কলুষ পুরুষ নহে সমাজের ভার!
তারা সমাজের প্রাণ তারা সমাজের মান
তাদেরি বঞ্চনে মুগ্ধা ওই অভাগীরা,
ওরা শুধু সমাজের কলঙ্কের ভরা।
তবু যদি ফিরে যেয়ে আর না আসিত ধেয়ে
পিশাচ পুরুষগণ বিষপাত্র হাতে,
প্রতিদিন উহাদিগে নরকে ডুবাতে,
তা'হলে তা'হলে বুঝি এত না রহিত মজি'
পথহারা অভাগীরা পাপেতে বিবশা,
আপনি বুঝিত শেষে আপনার দশা।
এমনি অভাগী তারা পাপের নিগড়-পরা
নাহি সাধ্য সেই কারা করিবে মোচন,
প্রতিদিন দেয় হুতি আপন জীবন।
হায়রে তাদের তরে, কেহ কি ভাবিবে না রে,
আছে কত দয়াবান্ জ্ঞানবান্ জন,
হেরিয়া ওদের দুঃখ কাঁদিবে না প্রাণ?
যারা ইহ পরকালে, ঘন ঘোর তমঃ জালে
আবরিয়া রাখিতেছে অমূল্য জীবন,
নিজ করে সে নিগড়ে করিয়া রচন;
বৃশ্চিক যেমন হায়, নিজে ক্ষত করি' কায়
অবশেষে নিজ বিষে হয়ে যায় হত,
উহারাও মরিতেছে নিত্য সেই মত।
এই বিশ্বেশ্বর যিনি, ক্ষমার সাগর তিনি
কত পাপ মুছিছেন ক্ষমার ধারায়,
তা না হলে মানবের কি হ'ত উপায়!
তোমার ক্ষমার চক্ষে, হায় উহাদের দুঃখে
কাঁদিবে না একবারো? তা'হলে কেমনে
ক্ষমার ভিখারী হবে বিভুর চরণে?
একবারো যদি তারে, মুছায়ে করুণ করে
ঘুচাইয়ে দাও তার ম্লান আবরণ,
কত অভাগিনী তবে পায়রে জীবন!
সখিরে, আপন সুখে, হর্ষ উছলিত বুকে,
আমরা কাটাই দিন কত অনাবিল,
উহাদের তরে কভু ভাবি নাকো তিল।
নিতান্ত নিষ্ঠুর মত মোরা আত্ম-সুখরত
নারী হয়ে পর দুঃখে করি না রোদন
—যে নারীর হৃদয়েতে প্রেমের ভবন!
হায় ওই অভাগীরা, অপার দুঃখেতে ঘেরা
পথহারা শক্তিহারা ইহ পরকালে,
কি হবে ওদের গতি অনন্ত নিখিলে?
আমারি তোমারি মত তারো আত্মা উর্দ্ধব্রত
সেও বিশ্ব-জননীর সন্তান জগতে
জীবন বহিছে সদা তাঁহারি দয়াতে।
হায় অভাগিনীগণ সে জীবন অনুপম

হারাইল চির তরে কি ঘোর পেষণে—
চল সখি সুধাইগে কেঁদে তার সনে।
যদি তার আঁখিজল, তার মোহ কোলাহল
মুছাইতে পারি মোরা ঘুচাইতে পারি,
সার্থক হইব মোরা এ জীবন ধরি।

শ্রীপ্রিয়বালা দেবী।

জাপানের বালিকাবিদ্যালয়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জাপানের রাজকীয় বিধি অনুসারে এখন প্রাথমিক শিক্ষা বালকও বালিকা উভয়ের পক্ষেই অবশ্যকর্ত্তব্য। কোন পিতা মাতারই পুত্র কন্যাকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ না করিয়া নিস্তার নাই। প্রাথমিক শিক্ষার পর বালক বালিকাদিগকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। বালিকাগণ তখন "উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে" শিক্ষালাভ করে। বালকদিগের জন্য যতদুর উচ্চ শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে, বালিকাদিগের জন্য ততদুর বন্দোবস্ত-নাই। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে এই সকল "উচ্চ বালিকা-বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখন সমগ্র জাপান সাম্রাজ্যে এই শ্রেণীর ৮০টী বিদ্যালয় আছে। তন্মধ্যে একটী সরকারী, ৭২টী সাধারণের ব্যয়ে এবং ৭টী ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিবিশেষের ব্যয়ে পরিচালিত হয়। পুরুষ ইনস্পেক্টরগণ এই সকল বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। জাপানে স্ত্রী ইনস্পেক্টর নাই। যাহা বিশেষ-ভাবে শুধু নারীগণকেই শিক্ষা দেওয়া হয়, সে সকল বিষয়ের কেহ পরিদর্শক নাই।

বালকদিগের মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয় ও বালিকাদিগের উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ের পাঠ প্রায় সমান। বালিকা-গণকে বিজ্ঞান অল্পই শিক্ষা দেওয়া হয়, তৎপরিবর্ত্তে শেলাই ও গীতবাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষা দেওয়া হয়। বালিকাদিগকে ব্যায়াম এবং ড্রিলেও শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়।

জাপানে বালকদিগকে বিদ্যালয়-গৃহ, ব্যায়াম-স্থল প্রভৃতি পরিষ্কার করিতে হয়। অনেক বালিকাবিদ্যালয়েও এই বিধি। বালিকাদিগের শাসনের জন্য কোন বিধি ব্যবস্থা নাই, কারণ কদাচিৎ তাহারা অশিষ্ট ব্যবহার করে। তাহাদের আচরণ অসন্তোষকর হইলে তাহা-দিগকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করা হয়। অন্য প্রকার শাস্তি প্রায় নাই বলিলেই চলে, কিন্তু কখনও অন্য রকম কোন শাস্তির বিধান হইলে সেই শাস্তি প্রয়োগ করা শিক্ষকের পক্ষে বড় কঠিন। বিদ্যালয়ে তখন মহা গোলযোগ উপস্থিত হয়।

বালিকাগণকে দ্বাদশ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে উচ্চ বিদ্যালয়ে গ্রহণ করা হয় না। এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে বালিকাগণের অন্ততঃ দুই বৎসর উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করা আবশ্যক। বিদ্যালয় সংখ্যা ছাত্রী সংখ্যার তুলনায় অপ্রচুর। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ১১০০০হাজার ছাত্রী উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থী হইয়াছিল, তন্মধ্যে স্থানাভাব বশতঃ এক তৃতীয়াংশ ছাত্রীকেই গ্রহণ করা হয় নাই।

উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষাকাল সাধারণতঃ চারি বৎসর। কারুকার্য্য শিক্ষার নিমিত্ত অনেকে এক বৎসর অতিরিক্ত অধ্যয়ন করে। জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য অনেকে আরো দুই বৎসর কাল শিক্ষালাভ করে। তার পর আবার উচ্চতম শিক্ষার জন্য কোন কোন বালিকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই তিন বৎসর অধ্যয়ন করে। শিক্ষিতব্য বিষয়গুলি প্রধানতঃ এই :—জাপানী ভাষা, নীতি শাস্ত্র, ইংরেজী বা ফরাসী ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান, চিত্রাঙ্কন, গার্হস্থ্য বিদ্যা, শেলাই, গীতবাদ্য এবং ব্যায়াম। গীতবাদ্য যাহারা অত্যন্ত কঠিন মনে করে, তাহারা তৎপরিবর্ত্তে শিক্ষাদান-প্রণালী ও কারুকার্য্য শিক্ষা করে। বিদেশীয় প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়াতে নারীচরিত্রে যে কঠোরতা প্রবেশ করি-বার আশঙ্কা আছে, তাহা দুর করিবার জন্য উপরোক্ত বিষয়গুলি ব্যতীত জাপানী আদব কায়দা শিক্ষায়ও অনেক সময় ব্যয়িত হয়। চা কি প্রকারে পরিবেশন করিতে হয়, ফুল কিরূপে সাজাইতে হয়, অতিথি অভ্যা-গতকে কিরূপে শুশ্রূষা করিতে হয়, বিবাহ সভায় কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, ইত্যাদি নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষাদান কালে বালিকাগণ জানু পাতিয়া উপবিষ্ট

থাকে, যাহাদের পাঠ গৃহীত হয় তাহারা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পদনিক্ষেপে, যথানির্দ্দিষ্ট হস্তভঙ্গী সহকারে শিক্ষকের নিকটবর্ত্তী হয়। ভদ্রতা, কোমলতা ও আত্মসংযম শিক্ষার জন্য এই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। ভারতবাসীগণের স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে জাপানের নিকট অনেক শিখিবার আছে। (সংকলিত।)

—

মগের মুল্লুক।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ট্যাভয়েতে একটী বড় সুন্দর শিল্প প্রচলিত আছে। আজকাল এই স্বদেশী আন্দোলনের দিনে আমাদের দেশে এ প্রথা থাকিলে নেতাদিগকে এত ভাবিতে হইত না। ইহাদের ঘরে ঘরে চরকা এবং তাঁত আছে। মান্দালে বা অন্য স্থান হইতে এ অঞ্চলে মোটা (coarse) ধরণের প্রচুর সূত্র আমদানি হয়। তাহাই চরকাদ্বারা মিহি এবং পরিষ্কার করণান্তর বিভিন্ন প্রকারের রং লাগাইয়া, প্রায়ই মেয়েরা—কচিৎ পুরুষেরাও তাঁতে ইহাদের লুঙ্গি বোনে। ইহারা শুধু সূতার নয়, রেশমি কাপড়ও বোনে এবং সেই সকল রেশমি কাপড় রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে বেশী দরে বিক্রয় হয়। ইহারা ছিটের কাপড়ই অধিক বোনে, কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে ইহারা সাদা কাপড় ব্যবহার করে না।

ইহারা আরও বহুপ্রকারের ব্যবসায় করে। তন্মধ্যে শুষ্ক মৎস্যের ব্যবসায় প্রসিদ্ধ। এখানে আমাদের দেশীয় মৎস্যের ন্যায় মৎস্য এবং বহু প্রকার নূতন ধরণের সমুদ্রিক মৎস্য পাওয়া যায়। ইহারা সেই সকল মৎস্য শুকাইয়া বিদেশে চালান দেয়। ব্রহ্মদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই এবং কলিকাতাতে ট্যাভয়ের শুট্‌কী (তাওয়াই শুট্‌কী বা দাওয়াই শুট্‌কী) মাছের অত্যন্ত আদর। এবং ব্রহ্মদেশের সর্ব্বত্র ট্যাভয়ের "ঙাপ্পি"র অত্যন্ত খ্যাতি। মাছ পচাইয়া তাহাতে নুন এবং আরও কয়েকটী দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া উদ্খিতে মিহি করিয়া কুটিয়া তাহাই তাল পাকাইয়া বিক্রয় করে। বর্ম্মাদের সমুদয় ব্যঞ্জনে এই "ঙাপ্পি" (আমাদের ঘৃতের ন্যায়) ব্যবহার না করিলে, ইহাদের নিকট সে ব্যঞ্জন সুস্বাদু হয় না। ইহারা মাছকে "ঙা" (nga) বলে। এবং সেই জন্যই এই "ঙা" কথা হইতে "ঙাপ্পি" কথার উৎপত্তি।

এতদ্ভিন্ন, ট্যাভয় ও মারগুই জেলার মধ্যে লবণের কারবার, টিন ও সোণা প্রভৃতির খনি আছে। ট্যাভয় হইতে ২০ মাইল দূরে সমুদ্রকূলে সিন্‌বুমিন্‌ ও লাংলন নামক স্থানদ্বয়ে সমুদ্রের জল শুকাইয়া লবণ তৈয়ারী হয়। সেজন্য এদেশে লবণ সস্তা। এখানে সোনা অতি সস্তা দরে পাওয়া যায়। মধ্যে মধ্যে রেঙ্গুন হইতে অনেক স্বর্ণকার এস্থানে স্বর্ণ কিনিতে আইসে।

ব্রহ্মদেশে সেলাইয়ের কল যত বিক্রয় হয়, ভারতের আর কোথাও বুঝি তেমন নয়। ইহাদের প্রতি ঘরে ঘরে সেলাইয়ের কল আছে। ইহারা নিজেদের গায়ের জামা প্রভৃতি নিজেরাই কলে সেলাই করিয়া লয়। ইহা ভিন্ন সরু ধরণের লেস্, উলের মোজা, টুপি, এবং চেয়ার, আয়না, আলো, প্রভৃতি সাজাইবার জন্য সুন্দর সুন্দর ঝালর প্রস্তুত করে, এবং তাহা বিক্রয় করে।

ইহারা কেহই কখন আলস্যে সময় ক্ষেপন করে না। ছোট বড় সকলেই, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা কখনই বসিয়া থাকে না। এক একজন স্ত্রীলোক কোন ব্যবসায়, সূচিশিল্প বা অন্য কোন প্রকারের পরিশ্রম দ্বারা এ প্রকার উপার্জ্জন করে, যে কেবল তাহাদের উপার্জ্জন দ্বারাই এক একটী সংসার চলিতে পারে। ইহারা ভরণ পোষণ, কি চলাফেরা কোন বিষয়েই পুরুষের মুখাপেক্ষী নহে।

আমাদের দেশে কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করিলেই বাড়ীর সকলের মনে কেমন একটা বিরক্তি ভাব দৃষ্ট হয়। পুত্র সন্তান জন্মিলে আনন্দের সীমা থাকে না। কেবল মাত্র কন্যার বিবাহে পণ-প্রথাই ইহার মূল কারণ। এবং সেই জন্যই যে ঘৃণার ভাব লোকের মনে উপস্থিত হইত, তাহাই এখন স্বাভাবিক ভাবে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এদেশে ঠিক ইহার বিপরীত ভাব দৃষ্ট হয়। ইহারা, কন্যাসন্তান জন্মিলে অত্যন্ত আনন্দিত হয়। তাহার একটী কারণও আছে। ইহাদের রীতি অনুসারে কন্যার বিবাহের পর স্বামীসহ সে পিত্রালয়েই অবস্থান করে এবং সেই কন্যাজামাতাই পিতামাতার ভরসাস্থল।

পার্সিফোনের প্রত্যাবর্ত্তন ।

অপর পক্ষে পুত্রসন্তান বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে চলিয়া যায়। পিতামাতার সহিত আর্থিক কোন সম্বন্ধ রাখিবার তাহার অধিকার থাকে না। অবশ্য আজকাল ক্রমশঃ এ সকল প্রথার পরিবর্ত্তন হইতেছে।

এদেশে হাটে, বাজারে, দোকানে বা রাস্তায় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকই অধিক দৃষ্ট হয়। বাজারে পুরুষ এক প্রকার দেখা যায় না বলিলেও বড় অত্যুক্তি হয় না। এখানে প্রতিদিন আমাদের গৃহের সম্মুখের শ্যাম রোড দিয়া শতাধিক স্ত্রীলোক, নানা প্রকার বাজারের জিনিষ মাথায় বহিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে যায়। পাঁচ সাত বৎসর বয়স্কা বালিকা হইতে প্রায় ষাট সত্তর বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধাকেও বাজারে বিক্রয়াদি করিতে যাইতে দেখিতে পাই। কেবল বিক্রয় নয়, ক্রয় করিতেও স্ত্রীলোকেরাই গিয়া থাকে। তাহারা বলে, "পুরুষে কি বাজার করিতে পারে? কি দিয়া কি রান্না হইবে বা কি খেতে ভাল, তা তাহারা কি প্রকারে বুঝিবে?" এদেশে মেয়েদের ক্রয় বিক্রয়ে পটুতা একটী বিশেষ গুণ বলিয়া গণ্য।

ট্যাভয় জেলা ভারত-সাম্রাজ্যের,—সুতরাং ব্রহ্ম-দেশেরও একেবারে শেষ প্রান্তে,—শ্যাম, মালয় প্রভৃতির নিকটে। ইহার পর আর মাত্র মারগুই জেলা আছে। সেজন্য ব্রহ্মদেশের অন্যান্য স্থান হইতে এ স্থানের ভাষাও অনেকটা পৃথক।

এদেশের গৃহ সকলই প্রায় কাষ্ঠনির্ম্মিত। ক্বচিৎ পাকা দালান দৃষ্ট হয়। এমন কি রেঙ্গুনেও অনেক বড় বড় ও সুন্দর সুন্দর বাড়ী সম্পূর্ণ কাঠের দৃষ্ট হয়। তবু রেঙ্গুনে অনেক পাকা বাড়ী আছে। কিন্তু প্রায়ই সে সকল বাড়ীর ছাদ পাকা নয়। কারণ এদেশে পাকা ছাদ টিকে না, বর্ষার যে স্থানেই পাকা দালান আছে সর্ব্বত্রই এই প্রকার। এদেশে ঝড়, ভূমিকম্প প্রভৃতির উপদ্রব নাই বলিয়া এই সকল গৃহের কোন অনিষ্ট হয় না। তবে আগুণের ভয় কিঞ্চিৎ অধিক। তবে ইহাও সত্য, যে এই পাঁচ বৎসর ব্রহ্মদেশে বাস করিতেছি, কিন্তু কোথাও কখনও বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড দেখি নাই।

এদেশে কাঠ সস্তা, ভাল কাঠও পাওয়া যায়। তবে এই ট্যাভয়ে তত ভাল কাঠ সহজলভ্য নহে। কাঠ সস্তা বলিয়াই এদেশে কাঠের ঘর দৃষ্ট হয়। মৌলমিন হইতে প্রতি সপ্তাহে কলিকাতায় অনেক কাঠের চালান যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রেমকুসুম রাহা।

এমাসের চিত্র।

পার্সিফোনের প্রত্যাবর্ত্তন গ্রীক পুরাণের একটী ঘটনা। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে গ্রীস দেশেও বহু দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। সিরেস অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীর কন্যা পার্সিফোনকে রসাতল-রাজ প্লুটো সিরেসের অজ্ঞাতসারে হরণ করিয়া লইয়া যায়। সিরেস কন্যাকে না পাইয়া পাগলিনীর ন্যায় নানা স্থানে তাহার অন্বেষণ করেন। লক্ষ্মী সন্তান-বিরহে অধীর ও স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে উদাসীন হওয়াতে সমস্ত পৃথিবী অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষে হাহাকার করিতে লাগিল। অবশেষে দেবদূত মারকুরি রসাতল হইতে পার্সিফোনকে মাতৃ সন্নিধানে লইয়া আসেন। বর্ত্তমান সংখ্যায় "পার্সিফোনের প্রত্যাবর্ত্তন" নামক চিত্রে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর মাতা ও কন্যার মিলনমুহূর্ত্তের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর লর্ড লেইটনের অঙ্কিত চিত্র হইতে ইহা গৃহীত হইয়াছে।

"শকুন্তলা-পত্রলেখন" মহাকবি কালিদাসের "অভি-জ্ঞান শকুন্তলম্" নামক নাটকের একটী ঘটনা হইতে গৃহীত। দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার পরিণয়-কাহিনী হিন্দু পৌরাণিক ঘটনা। মহাকবি কালিদাস এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া সুবিখ্যাত "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটক রচনা করিয়াছেন। কণ্বমুনির তপোবনে শকুন্তলাকে দর্শন করিয়া দুষ্যন্ত তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন, শকুন্তলাও দুষ্যন্তের অত্যন্ত অনুরাগিনী হইয়া উঠেন। তাঁহার প্রিয় সখী অনুসূয়া ও প্রিয়ম্বদার পরামর্শে বিরহ-কাতরা নবপ্রেমিকা শকুন্তলা দুষ্যন্তকে পত্র লিখিতেছেন,

অনুসূয়া ও প্রিয়ম্বদা পার্শ্বে উপবিষ্টা। সুবিখ্যাত রাজা রবিবর্ম্মার অঙ্কিত চিত্র হইতে এই চিত্রখানি গৃহীত।

"সীতা ও মায়ামৃগ" রামায়ণের সর্ব্বজন পরিচিত ঘটনা অবলম্বনে রাজা রবিবর্ম্মা কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে গৃহীত।

নুরজাহান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুন্দর জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। দিবাভাগে বৃষ্টিধারা ধূলিময় লাহোর নগরের আকাশকে ধূলিমুক্ত এবং উত্তপ্ত ধরণীকে স্নিগ্ধ করিয়া দিয়া গিয়াছে। সেই স্নিগ্ধতা ও চন্দ্রালোকে মিলিয়া চতুর্দ্দিকে অতি মধুর শান্ত সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়াছে। গীয়াসবেগ ও তাঁহার বেগম দ্বিতলের বারান্দায় বসিয়া এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছেন, নিম্নে তাঁহাদের প্রাসাদভিত্তিকে বিধৌত করিয়া প্রসন্নসলিলা যমুনা বহিয়া যাইতেছে।

বেগম বলিলেন,—"কি মধুর রাত্রি, চন্দ্রালোকিত রজনী আমার এত ভাল লাগে!"

গীয়াসবেগ বলিলেন, "অতি সুন্দর! কিন্তু সে দিনের কথা কি তোমার মনে পড়ে?—সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে অনাথের ন্যায় পাহাড়ে পাহাড়ে ভ্রমণ! সে দিন মনে হইতেছিল, সুন্দর শশধর যেন আকাশে থাকিয়া আমাদের প্রতি ভ্রুকুটী করিতেছিল, পৃথিবীও যেন আমাদিগকে আশ্রয় দিতে অসম্মত ছিল। ইহা একটা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভাবে মন যখন বিক্ষিপ্ত থাকে, তখন প্রকৃতির মহান সৌন্দর্য্যও মনকে স্পর্শ ও শান্ত করিতে পারে না।"

বেগম উত্তর করিলেন, "আজ এই মনোহর রজনীতে সেই দুঃখময় কাহিনী কেন স্মরণ করিতেছ? তোমার কথায় সে দিনের কথা স্মরণ হইয়া আমার মন বিষাদে অভিভূত হইতেছে। আহা, সেদিন শিশু কন্যাটীকে পরিত্যাগ করিবার চিন্তা আমাদের পক্ষে কি গুরুতর অন্যায়ই না হইয়াছিল! কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় দেখ, মিহরের জন্মমুহূর্ত্ত হইতে আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত!"

গীয়াস বলিলেন,—"তা সত্য বটে, ভাগ্য যেন কোন মহৎ নিয়তির জন্য তাহাকে প্রস্তুত করিতেছে! তাহার বয়স এখন মাত্র পোনর বৎসর, কিন্তু এখনই তাহার সংসার-জ্ঞান আশ্চর্য্য পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে। এখনই সে যেন আমাদের অপেক্ষা বেশী বুঝে! তাঁহার চিন্তা-শীলতা ও বুদ্ধি দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। সে শিল্পের এমন নূতন নূতন নমুনা আবিষ্কার করে এবং সেই সকল নমুনা অনুসারে এমন সুন্দর সুন্দর জিনিষ প্রস্তুত করে, যে আমি তাহা দেখিয়া বিস্মিত হই। ঈশ্বরকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব বুঝি না। সম্রাট্ আকবরের মত সদাশয় দয়ালু প্রভু, তোমার মত মধুর-প্রকৃতি গুণবতী ভার্য্যা, পরীর মত সুন্দরী দুহিতারত্ন,—সকলই তাঁহার করুণায়।"

বেগম বলিলেন, "তোমার মত প্রেমিক ও মহৎ স্বামী যে ঈশ্বর দয়া করিয়া আমায় দিয়াছেন, তজ্জন্য আমিও তাঁহার ধন্যবাদ করি। মিহর ত এখন দিন দিন পূর্ণচন্দ্রের মত সৌন্দর্য্যশালিনী রমণী হইয়া উঠিতেছে, তার উপযুক্ত একটী বর অনুসন্ধান না করিলে আর ত চলিতেছে না।"

"এবিষয় আমি অনেক দিন হইতে চিন্তা করিতেছি, এবং বরও ঠিক করিয়াছি, তুমিও বোধ হয় আমার প্রস্তাব অনুমোদন করিবে। তুমি আলি কুলিবেগকে জান, সে অতি সাহসী ও মহৎহৃদয় ব্যক্তি, তারও জন্মস্থান পারস্যে। মিহরকে তাহার সহিত বিবাহ দিতে আমি অঙ্গীকার করিয়াছি।"

বেগম বলিলেন, "মালেক মসুদ কিন্তু ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন, যে মিহর রাজরাণী হইবে; কিন্তু শাহ-জাদা সেলিম ত ইতিপূর্ব্বেই বিবাহ করিয়াছেন!" —বেগমের মনে একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা লুক্কায়িত ছিল।

"কি বল,—শাহজাদা সেলিম!"—বিরক্তি ও ঘৃণায় গীয়াসবেগের গণ্ড রক্তবর্ণ ধারণ করিল—"সেলিম! ভোগাসক্ত, পানাসক্ত, সেই লম্পটের কথা বলিতেছ! তাহার সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ অপেক্ষা আমার

মৃত্যু ভাল। আমি আবার পূর্ব্বের ন্যায় অসহায় গৃহহীনের মত পথে পথে বেড়াইতে রাজি আছি, তথাপি আমার কন্যাকে ইন্দ্রিয়াসক্ত সেলিমের ক্রীড়াপুত্তলি হইতে দিতে প্রস্তুত নই।"

বেগম বলিলেন, "স্বামিন, পতির অবিভক্ত প্রেম এবং নিজের সতীত্ব অপেক্ষা নারীর নিকট অধিকতর মূল্যবান আর কিছুই নাই। অর্থলোভে কন্যার সুখে জলাঞ্জলি দিবার কথা বলিতেছি না, কিন্তু সেলিম যদি পবিত্র প্রেম অন্তরে পোষণ করিয়া প্রস্তাব উপস্থিত করেন?"

"পবিত্র প্রেম!"—গীয়াসবেগ বলিলেন, "সেলিম পবিত্র প্রেম কোথায় পাইবে! আমি তাহাকে বেশ জানি, খুব ভাল করিয়াই জানি। এমন ভোগাসক্ত লম্পটের হৃদয়ে প্রকৃত প্রেম থাকিতে পারে না, প্রকৃত প্রেমের মর্ম্ম সে বুঝিতে পারে না। আমি আলি কুলিবেগের নিকট প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়াছি, যে তাহার সহিত মিহরের বিবাহ দিব। আলি কুলি অতি সজ্জন, বীর পুরুষ; আমি জানি সে মিহরকে প্রাণের সহিত ভালবাসিবে, নয়নের পুত্তলি করিয়া রাখিবে। তাহার সদ্গুণে মুগ্ধ হইয়া মিহরও নিশ্চয়ই তাহাকে ভাল বাসিবে।"

"তোমার দূরদর্শিতায় আমি চিরবিশ্বাসী, তুমি যাহা করিবে তাহাতে মিহর আমার সুখী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

"আলি কুলি অতি সৎপাত্র, বীরত্বে সম্রাটের সেনানীগণ মধ্যে সে কাহারও অপেক্ষা হীন নহে।"

"হাঁ, তোমার মুখে অনেক বার তাহার সুখ্যাতি শুনিয়াছি, ছেলেটী নাকি খুব বীর। আচ্ছা সে দেখিতে বেশ সুন্দর ত! মিহরের সঙ্গে মানাইবে ত!"

"মিহরের মত সে এত সুন্দর নয় বটে, তবে দেখিতে মন্দ নয়। মিহর যখন তাহার সৎগুণগুলির সংস্পর্শে আসিবে তখন নিশ্চয়ই তাহাকে ভালবাসিবে! সেও আমাদের মত রাজনৈতিক উৎপীড়নে দেশত্যাগ করিয়াছে। যখন সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করে, তখন সেও অত্যন্ত গরিব ছিল, কিন্তু আত্মশক্তিতে সে এখন উচ্চ পদমর্য্যাদার অধিকারী হইয়াছে। এই সকল কারণে আমি তাহার নিতান্ত পক্ষপাতী। সম্রাট তাহাকে সহস্র অশ্বারোহীর নায়কপদে নিযুক্ত করিয়াছেন।"

"তবে ত এখন আমাদের প্রথা অনুসারে বাগ্দান করিলেই হয়।"

হাঁ, তা বটে। তবে এই বাগ্দান কার্য্যটা একটা মহা হাঙ্গামার ব্যাপার। আমি নিজে শান্তিপ্রিয় লোক, গোলমাল জাঁকজমক এসকল কিছুই আমার ভাল লাগে না; কিন্তু যাহা রীতি আছে, করিতেই হইবে, এই সব অপ্রিয় জাঁকজমক গোলমাল সকলই না করিলে ত আর নিস্তার নাই।"

"তুমি বল কি? এসব না করিলে কি চলে? আমার কন্যার বাগ্দান অনুষ্ঠান আমাদের পদমর্য্যাদার উপযুক্ত হওয়া চাই।"

অবসন্নভাবে গীয়াস বলিলেন, "প্রিয়তমে, এত গোলমাল আমার পক্ষে কি কষ্টকর হইবে তুমি তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। খরচপত্রের জন্য আমি কিছুমাত্র চিন্তা করি না, কিন্তু একটু নির্জ্জনতা পাওয়া যাইবে না, দিন রাত কোলাহল—বাড়ীটা যেন একটা সরাইখানায় পরিণত হইবে—আমার নিকট এ সকল নিতান্ত বিরক্তিকর বোধ হয়।"

বেগম একটু আব্দারের ভাবে উত্তর করিলেন,—"তা বলিলে চলিবে কেন! বন্ধুবান্ধবদিগকে একটু আমোদ প্রমোদের সুযোগ দিবে, মিহরের সখিগণ একটু আমোদ আহ্লাদ করিবে—এ না হ'লে কি করিয়া চলিবে! মেয়েদের ভার আমার, তাহাদিগকে আদর আপ্যায়িত করা, আমিই সাধ্যানুসারে করিব। তোমার পুরুষ বন্ধুদিগকে একটা কুঠরীতে আবদ্ধ করিয়া তুমি না হয় তাহাদিগের নিকট শুষ্ক দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিও,—কি বল?"

"কিন্তু কথাটা এই, যে আমার বন্ধুগণও শুষ্ক দর্শনের আলোচনায় সন্তুষ্ট হইবেন না, আমোদ প্রমোদ না হইলে তাঁহাদেরও চলিবে না, সেই সকল বন্দোবস্ত ত আমাকেই করিতে হইবে!"

"আমি মিহরের কাছে এসকল কথা বলিব। সে

এমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি মেয়ে, তার মতামতটা জানা উচিত। আমি শুনিয়াছি, হিন্দুরা তাহাদের কন্যাদিগকে স্বামী-মনোনয়নের অধিকার দিত।”

“হাঁ, তাঁহারা পূর্ব্বে এরূপ করিত বটে, কিন্তু এখন তাহাদের ভুল বুঝিতে পারিয়াছে, তাই এখন ঐ প্রথা পরিত্যাগ করিয়াছে। তরুণী অনভিজ্ঞ বালিকা কোন হৃদয়বিহীন সুন্দর যুবকের রূপের খাতিরে তার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে, মোহে আসক্ত হইতে পারে, বাসনায় তার দৃষ্টি অন্ধ হইতে পারে, কিন্তু আমাদের প্রথা অনুসারে বালিকার কত সুবিধা দেখ! পরিণত-বয়স্ক পিতামাতা সকল দিক দেখিয়া শুনিয়া পাত্র নির্ব্বাচন করেন, কন্যা সেই পরিণত বিচারবুদ্ধির ফল লাভ করে। মিহরকে এ সকল কথা বলিবার কোন প্রয়োজন নাই। সে অতি পিতৃমাতৃভক্ত কন্যা, আমরা যেখানে পাঠাইব সে সেখানেই যাবে।”

“তা সত্য, কিন্তু পিতামাতাও অনেক সময় পাত্র নির্ব্বাচনে কন্যার কল্যাণ ছাড়িয়া অন্য অভিসন্ধি দ্বারা পরিচালিত হন। অনেক সময় পাত্রের প্রকৃত গুণের দিকে ততটা মনোযোগ না দিয়া তাহার সামাজিক পদমর্য্যাদা, এবং ধন সম্পদের প্রতিই অধিক দৃষ্টিপাত করা হয়; এবং অনেক সময়ই এই সকল বিবেচনার নিকট বালিকার সুখ চিরকালের জন্য বলি দেওয়া হয়, সে চির জীবন আপনার মন্দভাগ্যের জন্য পিতা-মাতাকে দোষারোপ করে। কিন্তু হিন্দু প্রথা অনুসারে, বালিকা যদি অসুখী হয়, তবে আর তাহার কাহাকেও নিন্দা করিবার কারণ থাকে না। যখন মানুষ আপনার ভুল বুঝিতে পারে, তখন ধৈর্য্যের সহিত স্বকৃত সকল কষ্ট বহন করিয়া থাকে, কিন্তু অপরের দোষে যখন আমাদিগকে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় তখন আমাদের সেই যন্ত্রণা যেন চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হয়।”

“তুমি যাহা বলিতেছ তাহা অনেকটা সত্য। কিন্তু এত তরুণী মেয়েরা তাহাদের স্বামী নির্ব্বাচন করিবে, এ আমার ভাল লাগে না। তারা যে-কোন সুন্দর লম্পটকে নির্ব্বাচন করিতে পারে। পিতা মাতা যে কন্যার পাত্রনির্ব্বাচনে কখন কখন তাহার কল্যাণ ছাড়িয়া অন্য অভিসন্ধি দ্বারা পরিচালিত হন এবং সেই সকল বিবাহের ফল যে ভাল হয় না, এ কথা সত্য। কিন্তু হিন্দুরা অবশ্যই তাহাদের প্রচলিত রীতির দোষ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, তাহা না হইলে কখনই তাহা পরিত্যাগ করিত না।”

কিঞ্চিৎ উচ্ছ্বাসের সহিত বেগম বলিলেন,—“কিন্তু তোমাকে এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, যে হিন্দুরা তাহাদের স্ত্রীলোকদিগকে একটুখানি সম্মান করে, নারীদিগের একটুখানি চিন্তাশক্তি, বিচারশক্তি আছে, নারীদিগেরও আত্মা ও হৃদয় আছে, এবং নিজ হৃদয়ের উপর তাহাদের অধিকার আছে, হিন্দুরা অন্ততঃ এতটুকু বিশ্বাস করে। কিন্তু তোমরা নারীদিগকে গৃহপালিত কতকগুলি জন্তু বই আর কিছুই মনে কর না। তোমরা তাহাদের প্রতি জন্তুর ন্যায়ই যথেচ্ছ ব্যবহার কর। তথাপি যে তাহারা সময় সময় আপনাদের শক্তি ও প্রভাবের পরিচয় দেয়, তাহা তোমাদের গুণে নয়, তাহাদের আত্মসংযমও হৃদয়ের শক্তির গুণে।”

গীয়াস প্রেমার্দ্র দৃষ্টিতে পত্নীর মুখপানে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, “তার প্রমাণ তুমি! তুমিও এইরূপে আমার হৃদয়ে রাজত্ব করিতেছ। কিন্তু কথা এই, হিন্দুরা এরূপ ভয়ানক কুসংস্কারাপন্ন জাতি, প্রচলিত রীতি নীতি তাহারা এরূপ অন্ধভাবে অনুসরণ করে, তথাপি চির-প্রচলিত বালিকার স্বামী-মনোনয়ন-প্রথা তাহারা এখন ত্যাগ করিল কেন? বালিকারা স্বামী মনোনয়নে ভুল করে বলিয়াই নয় কি?”

“হিন্দুদের যখন হইতে অধঃপতন হইল তখনই তাহারা এ প্রথা পরিত্যাগ করিয়াছে। প্রথাটার দোষে যে ইহা ত্যাগ করিয়াছে তা নয়। তোমাদের কতিপয় মুশলমান শাসনকর্ত্তার অত্যাচার ও যথেচ্ছাচারে তাহারা বাধ্য হইয়া এরূপ করিয়াছে। নারীর সম্মান রক্ষার জন্য হিন্দুরা এখন তাহাদিগকে গৃহকোণে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছে।”

“অত্যন্ত লজ্জার সহিত তোমার একথা আমায় স্বীকার করিতে হইতেছে! প্রথম যখন মুশলমানেরা এদেশে আসে তখন তাহারা পশুবৎ আচরণ করিয়াছিল।

তাহাদের অকারণে নিরপরাধ নরনারীর হত্যার কথা স্মরণ করিতেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। তাহাদের হৃদয় পাষাণে নির্ম্মিত ছিল।"

"ব্যাধ কি কখন বাণবিদ্ধ মৃগের যন্ত্রণা অনুভব করে? সে আহত প্রাণীটীর যে কি যন্ত্রণা উৎপাদন করে তাহা তার মনেই স্থান পায় না। আত্মসুখ এবং আত্মসুখের পরিতৃপ্তি সাধনে সে এতই ব্যতিব্যস্ত থাকে, যে যতক্ষণ তাহা ভোগ করিতে পায় ততক্ষণ তদুৎপন্ন অপরের দুঃখ তাহার মনকে স্পর্শও করিতে পারে না। মুশলমান বিজেতাদিগের হৃদয়ও তখন সম্ভবতঃ এই ভাবেই পূর্ণ ছিল।"

"নিশ্চয়ই তাই। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, যে কয়েক জন অতি সৎ লোকরঞ্জক রাজা আবির্ভূত হইয়া তাহাদের অপক্ষপাত ন্যায় বিচারে প্রজামণ্ডলীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন।"

"কিন্তু এখনও এমন মুশলমান দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের মুখে সেই সকল নিষ্ঠুর মুশলমান রাজাদিগের প্রশংসা আর ধরে না। সে দিন সেখ-উল-সদরের স্ত্রীর সহিত কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তিনি সেই নিষ্ঠুর রাজাদিগের কতই প্রশংসা করিতেছিলেন, আর আমাদের মহানুভব সম্রাট আকবরকে বিধর্ম্মী বলিয়া নিন্দা করিতেছিলেন। আমি আত্মসংবরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু পারি নাই। আমি তাহার কথায় প্রতিবাদ না করিয়া পারিলাম না। এই দুষ্ট সংসারে আকবরের ন্যায় সম্রাটও নিন্দা কুৎসার হাত অতিক্রম করিতে পারেন না।"

"যাদের বিশেষ কোন স্বার্থের সম্পর্ক আছে, তাহারাই এমন পরোপকারী মহৎহৃদয় লোকের নিন্দা করে। প্রজার কল্যাণের জন্য সম্রাট কি প্রকার সংগ্রাম ও চেষ্টা করিতেছেন বাহিরের লোকে তাহা কিছুই জানে না। তাঁহার আদর্শ এত উচ্চ, যে সাধারণ লোক তাহা ধারণাই করিতে পারে না। তিনি নিজের জন্য রাজ্য-শাসন করেন না, দেশের কল্যাণের জন্যই দেশ শাসন করেন। তিনি শাসন প্রণালীতে লোক-হিতকর মহা বিপ্লব সংঘটন করিয়াছেন। তিনি অনেক সময়ই বলেন, 'আমার বাসনা কামনার পরিতৃপ্তির জন্য ঈশ্বর আমাকে এখানে পাঠান নাই, প্রজাদিগের কল্যাণের জন্য, তাহাদিগকে সুপথে পরিচালিত করিবার জন্যই আমি এখানে প্রেরিত হইয়াছি।' এই বিবিধ-জাতি-সমন্বিত সমগ্র ভারতবাসীকে এক মহা জাতিতে পরিণত করিতে তাঁহার অক্লান্ত প্রয়াস দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।"

"কিন্তু গোঁড়া মুশলমানদিগকে বিরক্ত করাটা কি সম্রাটের সুবিবেচনার পরিচয় হইয়াছে?"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া গীয়াস উত্তর করিলেন, "উপায়ান্তর না পাইয়াই সম্রাট এরূপ করিয়াছেন। যতক্ষণ সম্ভব তিনি এই অপ্রীতি সংঘটিত হইতে দেন নাই। কিন্তু সেখ-উল-সদর সম্রাটের হিন্দু প্রজাদিগকে অকারণে এরূপে নির্য্যাতিত করিবে, উৎপীড়ন করিবে, তিনি কিরূপে তাহা সহিবেন? সম্রাট ত আর ভণ্ড কপটী হইতে পারেন না? তিনি প্রজাদিগের সমক্ষে একটী অতি উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি সকল ধর্ম্মমত হইতে বাছিয়া বাছিয়া উৎকৃষ্ট সত্য সকল সংগ্রহ করিয়া এক ধর্ম্মপ্রণালী গঠন করিয়াছেন। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টিতে হিন্দু ও মুশলমান সকলেই সমান, এমন কি কুকুরও ঘৃণার পাত্র নহে। শুকরমাংসও অখাদ্য নহে। সত্য ও ন্যায়ের পথ হইতে ভ্রষ্ট না হইলে লোকের বিভিন্ন প্রকার পানাহার, আচার ব্যবহার কিছুই দোষাবহ নহে।"

"সম্রাটের সুশাসনে সমগ্র দেশে কি সুখ শান্তিই না বিরাজ করিতেছে! তিনি যেন ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে মরুভূমিকে সুরম্য উদ্যানে পরিণত করিয়াছেন। লোকে বলে, কোন স্বর্গীয় আলোক যেন তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, সেই আলোকে তিনি সত্য ও মিথ্যা এবং কাহার ভিতরে কি গুণ আছে, অতি সহজে উপলব্ধি করিতে পারেন। দেখ না, আমরা কপর্দ্দকবিহীন অসহায়ের মত এদেশে আসিয়াছিলাম, তিনি তোমাকে তোমার উপযুক্ত উচ্চপদেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।"

বিনয়নম্র বচনে গীয়াস বলিলেন, "আমার কি মূল্য আমি তাহা জানি; স্বদেশে নিজের অক্ষমতার জন্যই ত বিখ্যাত ছিলাম। আমার কথা ছাড়িয়া দাও। কিন্তু একথা সত্য, যে সম্রাট যেন চুম্বকের ন্যায় শক্তিশালী

পুরুষদিগকে তাঁহার চতুস্পার্শ্বে আকর্ষণ করেন। আবুল ফজলের ন্যায় গভীর চিন্তাশীল, ফৈজির ন্যায় কবি, টোডরমলের ন্যায় অর্থনীতিবিশারদ, মানসিংহের ন্যায় সেনানায়ক, এবং বীরবলের ন্যায় মন্ত্রণাকুশল লোক তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেছে। ইঁহারা সকলেই সম্রাটের ন্যায় নিঃস্বার্থ ভাবে দেশের হিতকল্পে দেহমন নিয়োগ করিয়াছেন। যে দেশ এই প্রকার এতগুলি লোককে জন্ম দিতে পারে, সে দেশের ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল, সন্দেহ নাই।"

বেগম বলিলেন, "ফৈজির কবিতাবলী আমি পড়িয়াছি। তাঁহার ভাব অতি উচ্চ, অথচ কবিতা অতি কোমল—অতি মধুর!"

গীয়াস বলিলেন, ফৈজি একজন মহাকবি। তাঁহার ভাবরাশি সূর্য্যালোক-দীপ্ত নৃত্যশীলা পার্ব্বত্য তরঙ্গিনীর ন্যায় ধাবিত হয়। তুমি জান, সামরিক বন্দীরূপে ফৈজি সম্রাটের নিকট প্রথম আনীত হইয়াছিলেন, সম্রাটের প্রশ্নে তিনি কবিতায় উত্তর করিলেন,—"হে রাজন, আমি খাঁচায় বন্দী, দয়া করিয়া আমাকে মুক্ত করুন। আমি মধুরকণ্ঠ বিহঙ্গ, যখন মুক্তাকাশে বিচরণ করিতে পাই তখন আমার সঙ্গীত অধিকতর মিষ্ট হয়।' সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দরবারে স্থান দিলেন, সেই অবধি তাঁহারা এক দিনের তরেও পরস্পরের কাছ ছাড়া হন নাই।"

"বাস্তবিক ফৈজির লেখা অতি মধুর। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা আবুল ফজলের লেখা আমার নিকট বড় কঠিন বোধ হয়। অতি কঠিন ভাষায় তিনি মনোভাব ব্যক্ত করেন, কিন্তু ফৈজির লেখা সহজেই হৃদয় স্পর্শ করে।"

ফৈজি কবি মানুষ, আপনার হৃদয়ের আলোকে তিনি সমস্ত পদার্থের অন্তরালে এক প্রাণশক্তি—এক অদৃশ্য হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করেন, এবং আমাদের সমক্ষে তাহা জীবন্ত করিয়া তুলেন; আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে যাহা দেখিতে পাই না, তিনি আমাদিগকে সেই এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে লইয়া যান। আর আবুল ফজল জ্ঞানী পুরুষ, ঘটনা সমূহের কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ স্থির করিতে না পারিলে তিনি কিছুতেই সন্তুষ্ট হ'ন না। তাঁহার পথ জ্ঞানের জটিল পথ, ফৈজির পথ হৃদয়ের অনুভূতির পথ।"

বেগম বলিলেন, "তুমি যা বলিলে, সত্য। কিন্তু বীরবলকে তুমি এই মাত্র মন্ত্রণাকুশল সভাসদ বলিলে, কিন্তু আমরা ত তাঁহাকে একজন ভাঁড় বলিয়াই শুনি, তাঁহার তীব্র বিদ্রূপ ও ভাঁড়ামির জন্যই ত তিনি প্রসিদ্ধ।"

"আকবরের ন্যায় সম্রাট একজন ভাঁড়কে স্বীয় বন্ধু-শ্রেণীর মধ্যে গ্রহণ করিবেন, ইহা কি কখন সম্ভব মনে কর? বীরবল অতি দূরদর্শী ব্যক্তি, তাঁহার অপূর্ব্ব রহস্য শক্তির দ্বারা তিনি বিষয় সমূহের সকল দিক অতি পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দিতে পারেন। সকল সভাসদ মিলিয়া যখন কোন বিষয় সম্বন্ধে নানাদিক বিচার করিয়া একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন, তাহাতে কোন ত্রুটী থাকিলে আপনার অদ্ভুত রসিকতা দ্বারা তিনি সেই ত্রুটী চক্ষের সমক্ষে এমন ভাবে উপস্থিত করেন, যে তাহা দেখিয়া সকলে হতভম্ব হইয়া পড়েন।"

বেগম কিঞ্চিৎ গৌরবের সহিত বলিলেন, "তুমিও নাথ, আকবরের সভার গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছ।" গীয়াসবেগ বলিলেন, "আমার বিভাগে আমি সাধ্যানুসারে সম্রাটের অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু হায়, মনে হয়, সম্রাট শান্তি, প্রেম ও ন্যায়ের যে সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহা বুঝি শিথিল বালুকাভিত্তির উপরই গঠিত হইয়াছে! যে চিন্তাশীল মস্তিষ্ক ইহা কল্পনা করিয়াছে, যে সবল হস্ত ইহা গঠন করিয়াছে এসংসার হইতে তাহা অপসৃত হইলেই এই পুণ্যমন্দিরও বুঝি ধূলিসাৎ হইবে! হায়, এতগুলি মহৎহৃদয় লোকের জীবন-শোণিতে শান্তি ও প্রেমের যে মুক্তদ্বার মহামন্দির নির্ম্মিত হইল, ভয়ানক ঘূর্ণিবায়ু তাহা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিবে! ঈশ্বর কেন যে এমন করেন কিছুই বুঝি না!"

"তিনিই তাহা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বুঝেন। আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান তাঁহার অসীম কার্য্যপ্রণালী কি করিয়া বুঝিবে? আমরা তাঁহার দৈবহস্তে রহিয়াছি, তাঁহার এই বিশাল সৃষ্টির ন্যায় তাঁহার প্রেমও অতি বিশাল—

এই অনুভূতিই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। আকবরের যে মহৎ শিক্ষাকে অতি আদরে হৃদয়ে ধারণ করা উচিত ছিল, তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া হয়ত এদেশের নরনারী আপনাদের অপদার্থতা প্রকাশ করিয়াছে, হয়ত কঠোরতর প্রণালীর মধ্য দিয়া ভগবান্ তাহাদিগকে আকবরের কার্য্যের মহত্ত্ব অনুভব করাইবেন।"

"এই যে পুরুষানুক্রমিক রাজ্যাধিকার প্রথা, ইহা বহু দোষের আকর। রাজা তেহমস আমার পিতাকে সহোদরের ন্যায় ভালবাসিতেন, তাঁহার পুত্র রাজা হইয়া আমাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। রাজা তেহমস জ্ঞানী ও গুণী মানুষের আদর করিতেন, তাঁহার পুত্র আমোদপ্রিয় লম্পটদিগের সমাদর করে, কাজেই রাজ্যের ন্যায়-বিচারে বাধা উপস্থিত হয়। আমি শুনিয়াছি, প্রাচীনকালে হিন্দুগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য রাজা মনোনীত করিত, তাহাতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি রাজপদে বিরাজ করিত। জনসাধারণও এই উপায়ে রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তায় কিছু মনোযোগী হইত।"

"হাঁ, এ খুব ভাল প্রণালী। আমি শুনিয়াছি, ফিরিঙ্গিদের রাজ্যে এই ধরণের একটা কি রকম প্রণালী এখনও প্রচলিত আছে এবং এই প্রণালীর কল্যাণে বহু শতাব্দী ধরিয়া সে দেশের লোকেরা শান্তি ও স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে। শুনিয়াছি, তাহারা নাকি বীরের জাতি।"

"আমাদের শাহাজাদা সেলিম যথেচ্ছাচারী যুবক, ভগবান তাঁহাকে সুপথে চালিত করুন, আকবর ও তাঁহার সহকারীরা যে বিশাল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা ভগবানের কৃপায় অটুট থাকুক।"

এক ভীষণ বজ্রনিনাদ এই প্রার্থনার উত্তর দিল। তাঁহারা কথাবার্ত্তায় এতই নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে আকাশে যে ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি চন্দ্রমণ্ডলকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিতেছিল সে দিকে এতক্ষণ দৃষ্টিপাতই করেন নাই। প্রকৃতি এই সময় অতি গম্ভীর আকার ধারণ করিল। দম্পতি তখন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া বিশ্রাম করিতে গেলেন। (ক্রমশঃ)

ম্যাট্‌সিনি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অজ্ঞাত-বাসের অশেষ যন্ত্রণা ম্যাট্‌সিনির নিকট অসহনীয় হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার পরলোকগত প্রিয়তম বন্ধু জ্যাকোপোর দুই ভ্রাতার সহিত ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এতদিন তাঁহাকে চোরের ন্যায় আত্মগোপন করিয়া দিন কাটাইতে হইতেছিল, এখন লণ্ডনে আসিয়া স্বাধীনতার বাতাসে প্রকাশ্যভাবে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু এখানেও সুখে বাস করা তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিল না। দারুণ অর্থাভাবে তিনি নিষ্পেষিত হইতে লাগিলেন। সংবাদপত্রে লিখিয়া যৎসামান্য আয় হইত, অর্থাগমের আর কোন উপায় ছিল না। এই সামান্য আয়ে অতি কষ্টে তাঁহার ও বন্ধুগণের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। ক্রমে তিনি মাতৃপ্রদত্ত অঙ্গুরী, নিজের পুস্তক, মানচিত্র, জুতা, জামা ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার করিতে লাগিলেন। কতদিন পরিচ্ছদের অভাবে তিনি ঘরের বাহির হইতে পারিতেন না। এই সময় তাঁহার অর্থশালী বন্ধুগণ তাঁহাকে টাকা ধার দিয়া সাহায্য করিতেন, কিন্তু আত্মসম্মান জ্ঞান অত্যন্ত প্রবল থাকাতে বন্ধুদের কাহারও নিকট হইতে কোন দান গ্রহণ করিতেন না। মৃত্যুর পূর্ব্বে অনুসন্ধান করিয়া সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া গিয়াছিলেন।

কিন্তু এ সময় আর্থিক কষ্ট অপেক্ষা তাঁহার মানসিক ক্লেশ বোধ হয় বেশী ছিল। মানুষ মাত্রেই সহানুভূতির জন্য ব্যাকুল। মানুষ যতই নিঃস্বার্থ, আত্মত্যাগী ও স্পৃহাশূন্য হউক না কেন হৃদয়ের অতি পবিত্রতম ভাব সমূহের প্রতিও সে অন্যের সহানুভূতি না পাইলে অস্থির হইয়া উঠে। কিন্তু ম্যাট্‌সিনির নিকটস্থ বন্ধুগণ কেহই ম্যাট্‌সিনির আদর্শ বুঝিত না, ম্যাটসিনির প্রতিষ্ঠিত নিয়মাদির অর্থ ধারণা করিতে পারিত না, ম্যাট্‌সিনির অন্তর্নিহিত গভীর ভাবগুলির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিত না। বন্ধুদের অধিকাংশই সাধারণ লোকের ন্যায় আপন আপন ভালমন্দ বুঝিত, অপর

দশ জনের সঙ্গে দেশের জন্য কিছু করিতেও প্রস্তুত ছিল, ম্যাট্‌সিনির বিরাট ও উন্নত আদর্শ অনেক সময় তাহাদের নিকট অর্থশূন্য বোধ হইত। এই সময় অর্থাভাব, ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা এবং ম্যাটসিনির প্রতি আন্তরিক সহানুভূতির অভাবে তাঁহার সোদর তুল্য জ্যাকোপোর অনুজদ্বয় বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া দেশে চলিয়া গেল।

অর্থহীন, বন্ধুহীন ম্যাট্‌সিনি মহানগরী লণ্ডনের মুক্ত বায়ুতেও নির্জ্জন-বাসের ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তর্নিহিত যে মহান্ আদর্শের সৌন্দর্য্য, জ্যোতি ও মহত্বে তিনি মগ্ন ও আত্মহারা, জাতীয় স্বাধীনতার ও মানবীয় গৌরবের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবার যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়াছিল, চতুর্দ্দিক হইতে সেই বিষয়ে কোনও সহানুভূতি না পাইয়া, তিনি প্রস্তরের ন্যায় নির্ব্বাক কঠোর হইয়া পড়িতে লাগিলেন। বন্ধুদিগের অকৃতজ্ঞতা, সহযাত্রীদিগের পৃষ্ঠ-প্রদর্শন, তাঁহার মনকে আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—হায়, সব বৃথা হইল; অনর্থক বন্ধুদিগকে ঘোর দুর্দ্দশার মধ্যে আনিলাম; কেন মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাতে ছুটিয়া মরিলাম, কাহাকেও সুখী করিতে পারিলাম না! তাঁহার মনে হইতে লাগিল, তাঁহার দ্বারা কোনও কাজ হইবে না! এই সময় তিনি তাঁহার এক প্রিয় বন্ধুকে এইরূপ লিখিয়াছিলেন,—"আমার জন্য প্রার্থনা করিও, আমি যেন মৃত্যুর পূর্ব্বে কোনও একটা কাযের যোগ্য হই।"

এই ঘোর অন্ধকার হইতে, ম্যাট্‌সিনিকে কে আবার কর্ত্তব্যের পথে লইয়া গেল? তাঁহার অন্তর্নিহিত মহত্ব—জীবনের মহত্ব-বোধ—আত্মত্যাগ-প্রবৃত্তি ও প্রেম। আত্মসুখস্পৃহাকে তিনি মানব জীবনের কলঙ্কের বিষয় বোধে ঘৃণার সহিত বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, স্বার্থনাশই একমাত্র ধর্ম্ম; ঈশ্বরের প্রতি, মানবজাতির প্রতি ও স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্যই জীবনের একমাত্র বিধি; এবং ইহাই তিনি দৃঢ়ভাবে ধরিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, এ জীবন সুখী হইবার জন্য নয়, পবিত্র হইবার জন্য, উন্নততর লোকের উপযুক্ত হইবার জন্য; সে লোকে প্রিয়জনগণ আবার মিলিত হইবে, তাহাদের ভ্রমপ্রমাদ দূর হইবে, প্রেম সর্ব্বোপরি রাজত্ব করিবে।

একদিকে এই ধর্ম্মভাব, পারমার্থিকতা, অপর দিকে প্রদীপ্ত প্রেম! আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়াও ম্যাট্‌সিনির হৃদয় সহানুভূতি ও অপরের প্রেমলাভের জন্য কত ব্যাকুল ছিল! তিনি একখানি পত্রে লিখিয়াছেনঃ—"আমি যখন নিরাশার অন্ধকারে আপনাকে নিতান্ত একাকী বোধ করি, সে সময় কি আমার ইচ্ছা হয় না, যে কাহারও মাথার উপর আমার কপোল স্থাপন করি, এবং কাহারও প্রেমপূর্ণ বাহু আমার মস্তক স্পর্শ করুক? তা মনে করো না। কিন্তু উপায় যে নাই!" এই ভাবের সহিত আত্মসুখের সংস্রব আছে বলিয়া তিনি ইহাও মনে স্থায়ী হইতে দেন নাই। তখনও লণ্ডনে কেহ তাঁহার বন্ধু হয় নাই। রাজনৈতিক সমিতির মধ্যেও কেহ তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতে পারে নাই। কিন্তু তাঁহার কৈশোরের প্রিয়জন,—তাঁহার মাতা, পিতা ও কুমারী ভগিনী, এবং ম্যাডাম্ রাফিনি—ইঁহারা, তাঁহার হৃদয় পূর্ণ করিয়া ছিলেন। সেই অন্ধকারে ইঁহাদের মধুময় স্মৃতি তাঁহার অন্তরে বিমল জ্যোতি দান করিত। এই সময় ম্যাডাম্ রাফিনিকে একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন,—"আমি প্রতিদিন বেশী করিয়া ঈশ্বরের শক্তি ও বিধি অনুভব করিতেছি; কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে কাঁদিতে পারেন না, আমার আত্মার শূন্যতাও পূর্ণ করিতে পারে-না। * * * আমি তাঁর পূজা করি। কিন্তু আপনাকে ভালবাসি।" তিনি পত্রে হৃদয়ের কপাট খুলিয়া দিয়া তাঁহার নিকট মনের ভাব ব্যক্ত করিতেন। কিন্তু হায়, সামান্য কারণে, অপরের চক্রান্তে, এমন মাতৃস্থানীয়া মহিলার সহিত ম্যাট্‌সিনির সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় কুমারী-ভগিনী ফ্রান্সেসার মৃত্যু হইল। ইহাতে ম্যাট্‌সিনি হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলেন। এবং বৃদ্ধ পিতামাতার একাকীত্ব স্মরণ করিয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন। এই সময় তাঁহার পিতা সঙ্কটাপন্ন রোগাক্রান্ত হইয়া বহুকষ্টে বাঁচিয়া উঠিলেন। ম্যাট্‌সিনি সন্তানের কর্ত্তব্য কি করিয়া করিবেন, বৃদ্ধ পিতামাতাকে কি করিয়া সুখী করিবেন ও শান্তি দিবেন ভাবিয়া অস্থির হইলেন। অবশেষে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে গোপনে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রশশী গুপ্ত।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

রাজা রুক্মাঙ্গদ ও মোহিনী।

১৬৬

ভারত-মহিলা

The woman's cause is man's ; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ?

Tennyson.

২য় ভাগ । } মাঘ, ১৩১৩ । { ৬ষ্ঠ সংখ্যা ।

Beu 618
8
BENGAL LIB
27 MAR. 190
WRITERS' BUIL
Blo 70
18/ 1907

ভগ্নিগণের প্রতি নিবেদন ।*

প্রিয় ভগিনীগণ, আপনারা আমাকে এই মহিলা-পরিষদের সভানেত্রীত্বে বরণ করিয়া আমার প্রতি অতি উচ্চ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। কলিকাতার "মহিলা সমিতি" যখন পরিষদের অধিবেশনে নেত্রীত্ব করিবার জন্য বরোদায় আমার নিকট নিমন্ত্রণ প্রেরণ করেন তখন প্রথমতঃ আমি এই সম্মানসূচক পদ গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলাম ; কারণ আমি জানি, এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার জন্য আপনাদের মধ্যে আমা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি রহিয়াছেন। কিন্তু আমি অনুভব করিলাম যে, যে সদয় ভাব দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আপনারা ভারতের অপর প্রান্তে আমাকে নিমন্ত্রণ প্রেরণ করিলেন, আমার প্রত্যাখ্যানে আপনাদের সেই সদয় ভাবের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হইবে। বঙ্গীয়া ভগিনীগণ, এই কারণেই আমি আপনাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণে সম্মত হইয়াছি। এখন যদি আমি যথোচিত যোগ্যতার সহিত অদ্যকার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে না পারি, তবে আপনারা আমার ত্রুটী গ্রহণ করিবেন না, কারণ আমাকে আপনাদের সভানেত্রীর পদে বরণ করিবার জন্য আপনারাই দায়ী।

সর্ব্ব প্রথমে, পুনরায় আপনাদের মধ্যে উপস্থিত হইবার এই সুযোগ লাভ করিয়া আমি আমার আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। অল্প দিন হইল আমি দূরদেশে বহু ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি ; ফ্রান্স ও ইংলণ্ড, জার্ম্মেনী ও অষ্ট্রীয়া, সুইজার্লণ্ড ও আমেরিকায় ভ্রমণ করিয়াছি, এবং অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সেই সকল দেশের শিল্প ও কৃষি এবং সমাজ ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠান গুলির † তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছি। কিন্তু অদ্য ভাবান্তর হৃদয়ে লইয়া আমি আপনাদের মধ্যে আসিয়াছি ;—গৃহত্যাগী যে ভাবে গৃহে ফিরিয়া আসে, নির্ব্বাসিত যে ভাবে পুনরায় স্বগৃহে গৃহীত হয়, সেই ভাবে আজ আমি এখানে আসিয়াছি।

দুই বৎসর পূর্ব্বে আপনারা অতি আদরে, অতি সদয় ভাবে আমাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বরোদায় যেমন,

* গত ২৯শে ডিসেম্বর "ভারত-মহিলা পরিষদের" তৃতীয় অধিবেশনে সভানেত্রী শ্রীমতী বরোদার মহারাণী কর্ত্তৃক প্রদত্ত ইংরাজী বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ।

† ইংরাজী institution শব্দের এই বাংলা নামকরণ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কৃত।

১৬৬ ১৬৭

এই বঙ্গদেশেও তেমনি আজ আমি আপনাকে স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অনুভব করিতেছি; এখানেও আমি আমাদের সহিত একই কার্য্যে, একই চেষ্টায় প্রবৃত্ত ভগিনীগণের মধ্যে—একই মাতৃভূমির কন্যাগণের মধ্যে অবস্থিত।

আপনাদের "মহিলা-সমিতির" একটী প্রধান উদ্দেশ্য, জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর মহিলাগণের মধ্যে একতা স্থাপন করা। আমাদের পুরুষগণ জাতীয় মহাসমিতি ও বিবিধ সম্মিলনের (Conferences) সাহায্যে বৎসরের পর বৎসর পরস্পরের সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠতায় আবদ্ধ হইতেছেন, কিন্তু আমার বোধ হয়, ভারতের জাতীয় একতা সাধনে আমাদের—ভারতের মহিলাবৃন্দের—প্রভাবও পুরুষগণের প্রভাব অপেক্ষা অল্প শক্তিশালী নহে। গৃহে আমরা পরস্পরের সহিত মিলিত হই, অন্তঃপুরে আমরা পরস্পরকে শ্রদ্ধা করিতে ও ভালবাসিতে শিক্ষা করি; যে বন্ধনে জাতীয় জীবন দৃঢ়-সংবদ্ধ হয় আমরা সেই বন্ধনরজ্জুতে শক্তি সঞ্চার করি। কারণ, যদিও আমরা সহস্র সহস্র যোজন দূরে দূরে বাস করি, যদিও আমরা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলি, তথাপি একই ভাব ও একই প্রয়াসে আমরা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। বড় হই আর ছোট হই, ধনী হই আর দরিদ্র হই, একই অতীত ইতিহাসের গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত, ভবিষ্যতের একই মহা-আকাঙ্ক্ষায় আমরা অনুপ্রাণিত, এবং একই প্রেমের বন্ধনে আমরা সম্বদ্ধ।

ভারতের ইতিহাস ও সাহিত্য-জ্ঞানের প্রসার সংসাধন "মহিলাসমিতির" আর একটী উদ্দেশ্য। আমার বোধ হয়, এই বিষয়েও পুরুষগণ অপেক্ষা নারীগণের প্রভাবই দূর-প্রসারী। শৈশবে ও বাল্যকালে আমরা আমাদের সন্তানগণের চিত্তবৃত্তি গঠিত করি; আমরা তাহাদের অন্তরে আমাদের অতীত ইতিহাসের প্রতি প্রীতি ও গৌরব এবং আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার করিতে পারি। আমার বোধ হয়, এই উন্নত প্রদেশে এমন শক্তিশালিনী লেখিকা আছেন যাঁহাদের গ্রন্থ এ দেশের সাহিত্যে চিরজীবী হইয়া থাকিবে, কিন্তু আমাদের সকলেরই (যাহাদের এরূপ উচ্চ শক্তি নাই তাহাদেরও) আমাদের সন্তানগণের অন্তরে আমাদের সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি প্রীতি সঞ্চার করিবার শক্তি আছে। আপনারা আমার কথায় বিশ্বাস করিবেন, শৈশব-শিক্ষার ফল—মাতৃক্রোড়ে শিশু যে শিক্ষালাভ করে তাহার ফল—আমরা যাহা মনে করি তদপেক্ষা অনেক অধিক। ভারতের পুরুষজাতি ও নারীজাতি আমাদেরই হাতগড়া জিনিষ। আসুন তবে, আমরা—এদেশের মাতৃগণ—দেশ-সেবার উপযোগী করিয়া ভারতের ভাবী পুরুষ ও নারীজাতিকে গড়িয়া তুলি।

এ দেশের শিল্পের উন্নতি সাধন আপনাদের "মহিলা-সমিতির" এবং এই পরিষদের একটী উদ্দেশ্য। স্বদেশী আন্দোলনে বঙ্গমহিলাগণ কিরূপ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহারা এই আন্দোলনকে কিরূপ শক্তিশালী করিয়াছেন, আমি তাহা অবগত আছি। এই আন্দোলন এখন উত্তর-ভারত ও পঞ্জাবে, গুজরাট ও দক্ষিণাপথে, মান্দ্রাজ, মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুরে—বিশাল ভারত-খণ্ডের সর্ব্বত্র—দ্রুত গতিতে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। আপনারা অপূর্ব্ব সাহসের সহিত এই যে মহা আন্দোলনে জীবন সঞ্চার করিয়াছেন, আশ্চর্য্য দক্ষতা সহকারে এই আন্দোলনকে কি প্রকারে শক্তিশালী করিয়াছেন, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে প্রশংসমান দৃষ্টিতে আমরা তাহা অবলোকন করিয়াছি। আজ এই দেশহিতকর, মহা প্রয়াসে সমগ্র ভারত যোগদান করিতেছে। ভারতের প্রতিপ্রদেশে দেশীয় শিল্প-ভাণ্ডার সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে; পশ্চিম-ভারতের শিল্পপ্রধান সহরগুলিতে কলের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে; বঙ্গদেশে গত দুই বৎসরে হস্ত-চালিত তাঁতের সংখ্যা দ্বিগুণ অপেক্ষাও বৃদ্ধি পাইয়াছে; ধাতুনির্ম্মিত দেশীয় দ্রব্যাদির ব্যবহার দিন দিন প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে। আমি শুনিয়াছি, সহস্র সহস্র তন্তুবায়, কাংসবণিক ও কর্ম্মকার—যাহারা এতকাল কর্ম্মশূন্য হইয়া বসিয়া ছিল—আবার স্ব স্ব শিল্পশালায় প্রবেশ করিয়াছে, এবং বহু গ্রাম্য গৃহে আমাদের দরিদ্র ভগিনীগণ—আমাদের গরিব শিল্পজীবিগণের মাতা, পত্নী ও দুহিতাগণ—অন্তরে নূতন আশার আলোক অনুভব করিতেছে, নূতন উৎসাহে

১৬২

আবার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে। জাতীয় উন্নতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করাই যদি প্রকৃত ইতিহাস হয়, তবে ভারতের ভাবী ইতিহাস এই বিস্ময়কর, এই অতি নূতন অথচ ইতিমধ্যেই এত সফল, এই মহা আন্দোলনের—যে আন্দোলনকে দৃঢ় ও স্থায়ী করিবার জন্য সমগ্র জাতি দৃঢ়সংকল্প—সেই আন্দোলনের বিবরণ বিবৃত করিবে। আসুন তবে, আমরা—ভারতের নারীসমাজ—সমস্ত মন প্রাণের সহিত এই আন্দোলনে যোগ দান করি; গার্হস্থ্য তৈজস দ্রব্য এবং আপন আপন ও সন্তানগণের পোষাক পরিচ্ছদ ক্রয় কালে আমরা যেন ভারতের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র শিল্পী ও তন্তুবায়ের কথা স্মরণ করি, আমাদের উপরে তাহাদের দাবী আছে, তাহাদের দুঃখ ক্লেশ দূর করিবার শক্তি আমাদের আছে, নিষ্ঠার সহিত আমরা যেন তাহা স্মরণ করি। এই বিশাল ভারত-ভূমির যে প্রদেশেই আমরা বাস করি না কেন, আমাদের প্রত্যেকের ধর্ম্ম-বিশ্বাস যাহাই হউক না কেন—আসুন, দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য, এই এক সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, এই মহা প্রয়াসে আমরা সকলে সম্মিলিত হই।

নব শতাব্দীর সূত্রপাতে ভারতের আকাশে এক নবালোক ফুটিয়া উঠিতেছে; আসুন আমরা সকলে সেই পরম পুরুষের নিকট—যিনি দুর্ব্বলকে বলদান করেন, অধঃপতিতকে উর্দ্ধে তুলিয়া ধরেন—সেই মহান দেবতার নিকট প্রার্থনা করি, যে এই আলোক যেন আমাদের মাতৃস্বরূপিণী প্রিয় জন্মভূমির পক্ষে সুদীর্ঘ দিবসের শুভ উষার আলোক-রশ্মি হয়।

সুলতানার স্বপ্ন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ভগিনী সারা বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—

"কিছুদিন পরে কয়েকজন বিদেশী লোক এদেশে আসিয়া আশ্রয় লইল। তাহারা কোন প্রকার রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত ছিল। তাহাদের রাজা ন্যায়সঙ্গত সুশাসন বা সুবিচারের পক্ষপাতী ছিলেন না,—তিনি কেবল স্বামীত্ব ও অপ্রতিহত বিক্রম প্রকাশে তৎপর ছিলেন। তিনি আমাদের সহৃদয়া মহারাণীকে ঐ আসামী ধরিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মহারাণী ত দয়াপ্রতিমা জননীর জাতি—সুতরাং তিনি তাঁহার আশ্রিত হতভাগ্যদিগকে ক্রুদ্ধ রাজার শোণিত-পিপাসা নিবৃত্তির জন্য ধরিয়া দিলেন না। প্রবল ক্ষমতাশালী রাজা ইহাতে ক্রোধান্ধ হইয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন।

"আমাদের রণসজ্জাও প্রস্তুত ছিল, সৈন্য সেনানীগণও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাঁহারা বীরোচিত উৎসাহে শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। তুমুল সংগ্রাম বাধিল—রক্ত গঙ্গায় দেশ ডুবিয়া গেল! প্রতিদিন যোদ্ধাগণ অম্লান বদনে পতঙ্গপ্রায় সমরানলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে লাগিল।

"কিন্তু শত্রুপক্ষ অত্যন্ত প্রবল ছিল, তাহাদের গতিরোধ করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। আমাদের সেনাদল প্রাণপণে কেশরীবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও শনৈঃ শনৈঃ পশ্চাৎবর্ত্তী হইতে লাগিল, এবং শত্রুগণ ক্রমশঃ অগ্রসর হইল।

"কেবল বেতনভোগী সেনা কেন, দেশের ইতর ভদ্র—সকল লোকই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। এমন কি ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ হইতে ষোড়শবর্ষীয় বালক পর্য্যন্ত সমরশায়ী হইতে চলিল। কতিপয় প্রধান সেনাপতি নিহত হইলেন; অসংখ্য সেনা প্রাণ হারাইল; অবশিষ্ট যোদ্ধাগণ বিতাড়িত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শনে বাধ্য হইল। শত্রু এখন রাজধানী হইতে মাত্র ১২।১৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত—আর দুই চারি দিবসের যুদ্ধের পরেই তাহারা রাজধানী আক্রমণ করিবে।

"এই সঙ্কট সময়ে সম্রাজ্ঞী জনকতক বুদ্ধিমতী মহিলাকে লইয়া সভা আহ্বান করিলেন। এখন কি করা কর্ত্তব্য ইহাই সভার আলোচ্য বিষয় ছিল।

"কেহ প্রস্তাব করিলেন, যে রীতিমত যুদ্ধ করিতে যাইবেন; অন্য দল বলিলেন, যে ইহা অসম্ভব—কারণ একে ত অবলারা সমরনৈপুণ্যে অনভিজ্ঞ, তাহাতে আবার কৃপাণ, তোষাদান, বন্দুক ধারণেও অক্ষমা; তৃতীয় দল বলিলেন, যে যুদ্ধনৈপুণ্য দূরে থাকুক—রমণীর শারীরিক দুর্ব্বলতাই প্রধান অন্তরায়।

"মহারাণী বলিলেন, 'যদি আপনারা বাহুবলে দেশ রক্ষা করিতে না পারেন, তবে মস্তিষ্ক বলে দেশ রক্ষার চেষ্টা করুন।'

"সকলে নিরুত্তর; সভাস্থল নীরব। মহারাণী মৌন-ভঙ্গ করিয়া পুনরায় বলিলেন, 'যদি দেশ ও সম্ভ্রম রক্ষা করিতে না পারি, তবে আমি নিশ্চয় আত্মহত্যা করিব।'

"এইবার দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লেডী প্রিন্সিপাল (যিনি সৌরকর করায়ত্ত করিয়াছেন) উত্তর দিলেন। তিনি এতক্ষণ নীরবে চিন্তা করিতেছিলেন—এখন অতি ধীরে গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন, যে বিজয় লাভের আশা ভরসা ত নাই,—শত্রু প্রায় গৃহতোরণে। তবে তিনি একটি সঙ্কল্প স্থির করিয়াছেন—যদি এই উপায়ে শত্রু পরাজিত হয়, তবে ত সুখের বিষয়। এ উপায় ইতিপূর্ব্বে আর কেহ অবলম্বন করে নাই—তিনিই প্রথমে এই উপায়ে শত্রু জয়ের চেষ্টা করিবেন। এই তাঁহার শেষ চেষ্টা—যদি ইহাতে কৃতকার্য্য হওয়া না যায় তবে অবশ্য সকলে আত্মহত্যা করিবেন। উপস্থিত মহিলাবৃন্দ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে তাঁহারা কিছুতেই দাসত্ব শৃঙ্খল পরিবেন না। সেই গভীর নিস্তব্ধ রজনীতে মহারাণীর সভাগৃহ অবলাকণ্ঠের প্রতিজ্ঞা-ধ্বনিতে পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইল। প্রতিধ্বনি ততোধিক উল্লাসের স্বরে বলিল, 'আত্মহত্যা করিব!' সে যেন ততোধিক তেজোব্যঞ্জক স্বরে বলিল, 'বিদেশীর অধীনতা স্বীকার করিব না!'

"সম্রাজ্ঞী তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলেন, এবং লেডী প্রিন্সিপালকে তাঁহার নূতন উপায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলেন।

"লেডী প্রিন্সিপাল পুনরায় দণ্ডায়মান হইয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন, 'আমরা যুদ্ধযাত্রা করিবার পূর্ব্বে পুরুষদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করা উচিত। আমি পর্দ্দার অনুরোধে এই প্রার্থনা করি।' মহারাণী উত্তর করিলেন, 'অবশ্য! তাহা ত হইবেই।'

"পর দিন মহারাণীর আদেশপত্রে দেশের পুরুষদিগকে জ্ঞাপন করা হইল, যে অবলারা যুদ্ধযাত্রা করিবেন, সে জন্য সমস্ত নগরে পর্দ্দা হওয়া উচিত। সুতরাং স্বদেশ ও স্বাধীনতা রক্ষার অনুরোধে পুরুষদের অন্তঃপুরে থাকিতে হইবে।

"অবলার যুদ্ধযাত্রার কথা শুনিয়া ভদ্রলোকেরা প্রথমে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না; পরে ভাবিলেন, 'মন্দ কি?' তাঁহারা আহত এবং অত্যন্ত শ্রান্ত ক্লান্ত ছিলেন—যুদ্ধে আর রুচি ছিল না, কাজেই মহারাণীর এই আদেশকে তাঁহারা ঈশ্বর-প্রেরিত শুভ আশীর্ব্বাদ মনে করিলেন। মহারাণীকে ভক্তিসহকারে নমস্কার করিয়া তাঁহারা বিনা বাক্যব্যয়ে অন্তঃপুরে আশ্রয় লইলেন। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে দেশরক্ষার কোন আশা নাই—মরণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। দেশের ভক্তিমতী কন্যাগণ সমরচ্ছলে মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন, তাঁহাদের এ অন্তিম বাসনায় বাধা দেওয়ার প্রয়োজন কি? শেষটা কি হয়, দেখিয়া দেশভক্ত সম্ভ্রান্ত পুরুষগণও আত্মহত্যা করিবেন।

"অতঃপর লেডী প্রিন্সিপাল দুই সহস্র ছাত্রী সমভিব্যাহারে সমর প্রাঙ্গনাভিমুখে যাত্রা করিলেন—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "দেশের পুরুষদিগকে ত পর্দ্দার অনুরোধে জেনানায় বন্দী করিলেন, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে পর্দ্দার আয়োজন করিলেন কিরূপে? উচ্চ প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া গুলিবর্ষণ করিয়াছিলেন না কি?"

"না ভাই! বন্দুক-গুলি ত নারী যোদ্ধাদের সঙ্গে ছিল না,—অস্ত্রদ্বারা যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনা থাকিলে আর বিদ্যালয়ের ছাত্রীর প্রয়োজন ছিল কি? আর শত্রুর বিরুদ্ধে পর্দ্দার বন্দোবস্ত করিবার আবশ্যক ছিল না—যেহেতু তাহারা অনেক দূরে ছিল; বিশেষতঃ তাহারা আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই অক্ষম ছিল।"

আমি রঙ্গ করিয়া বলিলাম,—"হয় ত রণভূমে মূর্ত্তিমতী সৌদামিনীদের প্রভা দর্শনে তাহাদের নয়ন ঝলসিয়া গিয়াছিল—"

"তাহাদের নয়ন ঝলসিয়াছিল সত্য, কিন্তু সৌদামিনীর প্রভায় নয়,—স্বয়ং তপনের প্রখর কিরণে!"

"বটে? কি প্রকারে? আর আপনারা বিনা অস্ত্রে যুদ্ধ করিলেন কিরূপে?"

"যোদ্ধাদের সঙ্গে সেই সূর্য্যোত্তাপ-সংগ্রহের যন্ত্র ছিল মাত্র। আপনি কখনও ষ্টীমারের সার্চলাইট (Search light) দেখিয়াছেন কি?"

"দেখিয়াছি।"

"তবে মনে করুন, আমাদের সঙ্গে অন্যূন দ্বিসহস্র সার্চলাইট ছিল,—অবশ্য সে যন্ত্রগুলি ঠিক সার্চলাইটের মত নয়, তবে অনেকটা সাদৃশ্য আছে; কেবল আপনাকে বুঝাইবার জন্য তাহাকে 'সার্চলাইট' বলিতেছি। ষ্টীমারের সার্চলাইটে উত্তাপের প্রাখর্য্য থাকে না, কিন্তু আমাদের সার্চলাইটে ভয়ানক উত্তাপ ছিল। ছাত্রীগণ যখন সেই সার্চলাইটের কেন্দ্রীভূত উত্তাপ-রশ্মি শত্রুর দিকে পরিচালিত করিলেন,—তখন তাহারা হয় ত ভাবিয়াছিল, একি ব্যাপার! শত সহস্র সূর্য্য মর্ত্তে অবতীর্ণ! সে উগ্র উত্তাপ ও আলোক সহ্য করিতে না পারিয়া শত্রুগণ দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া পলায়ন করিল! নারীর হস্তে একটি লোকেরও মৃত্যু হয় নাই—একবিন্দু নরশোণিতেও বসুন্ধরা কলঙ্কিত হয় নাই—অথচ শত্রু পরাজিত হইল! তাহারা প্রস্থান করিলে পর তাহাদের সমুদয় অস্ত্র শস্ত্র সূর্য্যকিরণে দগ্ধ করা গেল।"

আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিলাম, "যদি বারুদ দগ্ধকালে ভয়ানক দুর্ঘটনা হইয়া আপনাদের কোন অনিষ্ট হইত?"

"আমাদের অনিষ্টের সম্ভাবনা ছিল না, কারণ বারুদ ছিল বহুদূরে। আমরা রাজধানীতে থাকিয়াই সার্চলাইটের তীব্র উত্তাপ প্রেরণ করিয়াছিলাম। তবু অতিরিক্ত সতর্কতার জন্য জলধর বেলুন সঙ্গে রাখা হইয়াছিল।

তদবধি আর কোন প্রতিবেশী রাজা মহারাজা আমাদের দেশ আক্রমণ করিতে আইসেন নাই।"

"তার পর পুরুষ-প্রবরেরা অন্তঃপুরের বাহিরে আসিতে চেষ্টা করেন নাই কি?"

"হাঁ, তাঁহারা মুক্তি পাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কতিপয় পুলিশ কমিশনর ও জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট এই মর্ম্মে মহারাণীসমীপে আবেদন করিয়াছিলেন, যে যুদ্ধে অকৃতকার্য্য হওয়ার দোষে সমর-বিভাগের কর্ম্মচারীগণই দোষী, সেজন্য তাঁহাদিগকে বন্দী করা ন্যায় সঙ্গত হইয়াছে; কিন্তু অপর রাজপুরুষেরা ত কদাচ কর্ত্তব্যে অবহেলা করেন নাই, তবে তাঁহারা অন্তঃপুর-কারাগারে বন্দী থাকিবেন কেন? তাঁহাদের পুনরায় স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিতে আজ্ঞা হউক।

"মহারাণী তাঁহাদিগকে জানাইলেন, যে যদি আবার কখনও রাজকার্য্যে তাঁহাদের সহায়তার আবশ্যক হয় তবে তাঁহাদিগকে যথাবিধি কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইবে। রাজ্যশাসন ব্যাপারে তাঁহাদের সাহায্যের প্রয়োজন না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা যেখানে আছেন, সেইখানে থাকুন।

আমরা এই প্রথাকে 'জেনানা' না বলিয়া 'মর্দ্দানা' বলি।"

আমি বলিলাম, "বেশ ত! কিন্তু এক কথা,—পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট ইত্যাদি ত 'মর্দ্দানায়' আছেন, আর চুরি ডাকাতির তদন্ত এবং হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি অত্যাচার অনাচারের বিচার করে কে?"

"যদবধি 'মর্দ্দানা' প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তদবধি এদেশে কোন প্রকার পাপ কিম্বা অপরাধ হয় নাই; সেই জন্য আসামী গ্রেফ্‌তারের নিমিত্ত আর পুলিশের প্রয়োজন হয় না,—ফৌজদারী মোকদ্দমার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটেরও আবশ্যক নাই।"

"তাই ত, আপনারা স্বয়ং সয়তানকেই * শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছেন, আর দেশে সয়তানী † থাকিবে কিরূপে! যদি কোন স্ত্রীলোক কখনও কোন বে-আইনী কাজ করে, তবে তাহাকে সংশোধন করা আপনাদের পক্ষে কঠিন নয়। যাঁহারা বিনা রক্তপাতে যুদ্ধজয় করিতে পারেন,—অপরাধ ও অপরাধীকে তাড়াইতে তাঁহাদের কতক্ষণ লাগিবে?"

অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয় সুলতানা! আপনি এইখানে আরও কিছুক্ষণ বসিবেন, না আমার বসিবার ঘরে চলিবেন?"

আমি সহাস্যে বলিলাম, "আপনার রান্নাঘরটি রাণীর

* পুরুষ জাতিকে।

† পাপ।

বসিবার ঘর অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়! কিন্তু কর্ত্তাদের কাজ বন্ধ করিয়া এখানে আমাদের বসা অন্যায়; আমি তাঁহাদের বে-দখল করিয়াছি বলিয়া হয় ত তাঁহারা আমাকে গালি দিতেছেন!"

আমি ভগিনী সারার বসিবার ঘরে যাইবার সময় ইতস্ততঃ উদ্যানের সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া বলিলাম,—"আমার বন্ধুবান্ধবেরা ভারী আশ্চর্য্য হইবেন, যখন আমি দেশে গিয়া নারীস্থানের কথা বলিব,—নন্দনকানন-তুল্য নারীস্থানে নারীর পূর্ণ আধিপত্য, যৎকালে পুরুষেরা মর্দ্দানায় থাকিয়া রন্ধন করেন, শিশুদের খেলা দেন,—এক কথায় যাবতীয় গৃহকার্য্য করেন! আর রন্ধন প্রণালী এমন সহজ ও চমৎকার, যে রন্ধনটা অত্যন্ত আমোদজনক ব্যাপার! ভারতে যে সকল বেগম খানম প্রমুখ বড় ঘরের গৃহিণীরা রন্ধনশালার ত্রিসীমায় যাইতে চাহেন না, তাঁহারা এমন কেন্দ্রীভূত সৌরকর পাইলে আর রন্ধন কার্য্যে আপত্তি করিতেন না!"

"ভারতের লোকেরা একটু চেষ্টা করিলেই সূর্য্যোত্তাপ লাভের উপায় করিতে পারেন। বিশেষ এক খণ্ড কাচদ্বারা (Convex glass) যেমন রবিকর একত্রিত করিয়া কাগজাদি দগ্ধ করা যায়, সেইরূপ কাচ বিশিষ্ট যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে অধিক বুদ্ধি ও টাকা ব্যয় হইবে না।"

"জানেন ভগিনী সারা! ভারতবাসীর বুদ্ধি সুপথে চালিত হয় না—জ্ঞান বিজ্ঞানের সহিত আমাদের সম্পর্ক নাই। আমাদের সব কার্য্যের সমাপ্তি বক্তৃতায়—সিদ্ধি করতালি লাভে। কোন দেশ আপনা হইতে উন্নত হয় না, তাহাকে উন্নত করিতে হয়। নারীস্থানে কখনও স্বর্ণবৃষ্টি হয় নাই,—কিম্বা জোয়ারের জলেও মণিমুক্তা ভাসিয়া আইসে নাই?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "না!"

"তবেই দেখুন, ত্রিশ বৎসরে আপনারা একটা নগণ্য দেশকে সুসভ্য করিলেন,—না, প্রকৃত পক্ষে দশ বৎসরেই আপনারা এদেশকে স্বর্গতুল্য পুণ্যভূমিতে পরিণত করিতে পারিলেন। আর আমরা একটি সুসভ্য রত্নগর্ভা দেশকে ক্রমে উন্নত করিব দূরের কথা,—বরং ক্রমশঃ তাহাকে দীনতমা শ্মশানে পরিণত করিতে বসিয়াছি!"

"পুরুষের কার্য্যে ও রমণীর কার্য্যে এই প্রভেদ। আমি যে বলিয়াছিলাম, পুরুষেরা কোন ভাল কাজ সুচারুরূপে করিবার উপযুক্ত নয়, আপনি বোধ হয় এতক্ষণে সে কথাটা বুঝিতে পারিলেন?"

"হাঁ, এখন বুঝিলাম, নারী যাহা দশ বৎসরে করিতে পারে, পুরুষ তাহা শত শত বর্ষেও করিতে অক্ষম! আচ্ছা ভগিনী সারা, আপনারা ভূমিকর্ষণাদি কঠিন কার্য্য করেন কিরূপে?"

"আমরা বিদ্যুৎ-সাহায্যে চাষ করিয়া থাকি। চপলা আমাদের অনেক কাজ করিয়া দেয়,—ভারী বোঝা উত্তোলন ও বহনের কার্য্যও সে-ই করে। আমাদের বায়ু-শকটও তদ্দ্বারা চালিত হয়। দেখিতেছেন, এদেশে রেল-বর্ত্ম বা পাকা বাঁধা সড়ক নাই, কেবল পদব্রজে ভ্রমণের পথ আছে।"

"সেই জন্য এখানে রেলওয়ে দুর্ঘটনার ভয় নাই—রাজপথেও লোকে শকট-চক্রে পেষিত হয় না। যে সব পথ আছে, তাহা ত কুসুম-শয্যা বিশেষ! বলি, আপনারা কখন কখন অনাবৃষ্টি জনিত ক্লেশ ভোগ করেন কি?"

"দশ এগার বৎসর হইতে এখানে অনাবৃষ্টিতে কষ্ট পাইতে হয় না। আপনি ঐ যে বৃহৎ বেলুন এবং তাহাতে সংলগ্ন নল দেখিতে পাইতেছেন,—উহা দ্বারা আমরা যত ইচ্ছা বারিবর্ষণ করিতে পারি। আবশ্যক মত সমস্ত শস্যক্ষেত্রে জলসেক করা হয়। আবার জল-প্লাবনেও আমরা ঈশ্বরকৃপায় কষ্টভোগ করি না। ঝঞ্ঝাবাত এবং বজ্রপাতেরও উপদ্রব নাই।"

"তবে ত এদেশ বড় সুখের স্থান। আহা মরি! ইহার নাম 'সুখস্থান' হয় নাই কেন? আপনারা ভারত-বাসীর ন্যায় ঝগড়া কলহ করেন কি? এখানে কেহ গৃহবিবাদে সর্ব্বস্বান্ত হয় কি?"

"না ভগিনি! আমাদের কোঁদল করিবার অবসর কই? আমরা সকলেই সর্ব্বদা কাজে ব্যস্ত থাকি—প্রকৃতির ভাণ্ডার অন্বেষণ করিয়া নানা প্রকার সুখ স্বচ্ছন্দতা আহরণের চেষ্টায় থাকি। অলসেরা কলহ করিতে সময় পায়—আমাদের সময় নাই। আমাদের

গুণবতী মহারাণীর সাধ,—সমস্ত দেশটাকে একটি উদ্যানে পরিণত করিবেন!"

"রাণীর এ আকাঙ্ক্ষা অতি চমৎকার! আপনাদের প্রধান খাদ্য কি?"

"ফল।"

"ভাল কথা, আপানারাই ত সব কাজ করেন, তবে পুরুষেরা কি করেন?"

"বড় বড় কল কারখানায় যন্ত্রাদি পরিচালিত করেন; খাতা-পত্র রাখেন,—এক কথায় বলি, তাঁহারা যাবতীয় কঠিন পরিশ্রম, অর্থাৎ যে কার্য্যে কায়িক বলের প্রয়োজন, সেই সব কার্য্য করেন।"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"ওঃ! তাঁহারা কেরাণী ও মুটে মজুরের কাজ করিয়া থাকেন!"

"কিন্তু কেরাণী ও শ্রমজীবী বলিতে ঠিক যাহা বুঝায় এদেশের ভদ্রলোকেরা তাহা নহেন। তাঁহারা বিদ্যা, বুদ্ধি, সুশিক্ষায় আমাদের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহেন। আমরা শ্রম বণ্টন করিয়া লইয়াছি—তাঁহারা শারীরিক পরিশ্রম করেন, আমরা মস্তিষ্কচালনা করি। আমরা যে সকল যন্ত্রের উদ্ভাবনা বা সৃষ্টি কল্পনা করি, তাঁহারা তাহা নির্ম্মাণ করেন। নরনারী উভয়ে একই সমাজ-দেহের বিভিন্ন অঙ্গ,—পুরুষ শরীর, রমণী মন!"

"তা বেশ! কিন্তু ভারতবাসী পুরুষেরা একথা শুনিলে খড়্গহস্ত হইবেন! তাঁহাদের মতে তাঁহারা একাই এক সহস্র—'তনমন' সব তাঁহারা নিজেই! আমরা তাঁহাদের 'ছাই ফেলিবার জন্য ভাঙ্গাকুলা' মাত্র! আপনাকে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না, আপনারা গ্রীষ্মকালে বাড়ী ঘর ঠাণ্ডা রাখেন কিরূপে? আমরা ত বৃষ্টিধারাকে স্বর্গের অমিয়-ধারা মনে করি।"

"আমাদেরও সুস্নিগ্ধ বৃষ্টিধারার অভাব হয় না। তবে আমরা পিপাসী চাতকের ন্যায় জলধরের কৃপা প্রার্থনা করি না; এখানে কাদম্বিনী আমাদের সেবিকা—সে আমাদের ইচ্ছানুসারে শীতল ফোয়ারায় ধরণী সিক্ত করিয়া দেয়। আবার শীতকালে সূর্য্যোত্তাপে গৃহগুলি ঈষৎ উত্তপ্ত রাখা হয়।"

অতঃপর তিনি আমাকে তাঁহার স্নানাগার দেখাইলেন। এ কক্ষের ছাদটা বাক্সের ডালার মত; ছাদ তুলিয়া ফেলিয়া ইচ্ছামত বৃষ্টিজলে স্নান করা যায়। প্রত্যেকের গৃহপ্রাঙ্গনে বেলুনের ন্যায় বৃহৎ জলাধার আছে,—আদি বেলুনের সহিত ঐ জলাধার গুলির যোগ আছে। আমি নম্রভাবে বলিলাম, "আপনারা ধন্য! স্বয়ং প্রকৃতি আপনাদের সেবাদাসী, আর চাই কি! পার্থিব সম্পদে ত আপনারা অতিশয় ধনী; আপনাদের ধর্ম্মবিধান কিরূপ—জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

"আমাদের ধর্ম্ম প্রেম ও সত্য। আমরা পরস্পরকে ভালবাসিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য, এবং প্রাণান্তেও সত্য ত্যাগ করিতে পারি না। যদি কালে ভদ্রে কেহ মিথ্যা বলে—"

"তবে তাহার প্রাণদণ্ড হয়?"

"না, প্রাণদণ্ড হয় না। আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টিজগতের জীব হত্যায়—বিশেষতঃ মানব হত্যায় আমোদ বোধ করি না। কাহারও প্রাণনাশ করিতে অপর প্রাণীর কি অধিকার? অপরাধীকে নির্ব্বাসিত করা হয়, এবং তাহাকে এ দেশে কিছুতেই পুনঃপ্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না।"

"কোন মিথ্যাবাদীকে কখনও ক্ষমা করা হয় না কি?"

"যদি কেহ অকপট হৃদয়ে অনুতপ্ত হয়, তাহাকে ক্ষমা করা যায়।"

"এ নিয়ম অতি উত্তম। এখানে যেন ধর্ম্মই রাজত্ব করিতেছে। ভাল, একবার মহারাণীকে দেখিতে পাইব কি? যিনি করুণাপ্রতিমা, নানা গুণের আধার, তাঁহাকে দেখিলেও পুণ্য হয়।"

"বেশ চলুন!" এই বলিয়া ভগিনী সারা যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। এক খণ্ড তক্তায় দুইখানি আসন স্ক্রু দ্বারা আঁটা হইল; পরে তিনি কতিপয় গোলা আনিলেন, গোলা কয়টি দেখিতে বেশ চক্চকে ছিল; কোন্ ধাতুতে গঠিত তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না, আমার মনে হইল উৎকৃষ্ট রৌপ্য-নির্ম্মিত বলিয়া। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার ওজন কত। আমি ত জীবনে কখনও ওজন হই নাই, কাজেই নিজের

গুরুত্ব আমার জানা ছিল না; ভগিনী বলিলেন,—"আসুন তবে আপনাকে ওজন করি। ওজনটা জানা প্রয়োজন।"

আমি ভাবিলাম, এ কি ব্যাপার! যাহা হউক ওজনে আমি এক মন ষোল সের হইলাম। শুনিলাম, তিনি আটত্রিশ সের মাত্র! তবে ভগিনী সারার অপেক্ষা আর কোন গুণে না হউক, আমি গুরুত্বে বেশী ত।

তার পর দেখিলাম, ঐ চক্রকে গোলার ছোট বড় দুইটি গোলা এই তক্তায় সংযোগ করা হইল। আমি প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, সে গোলা হাইড্রোজেন পূর্ণ। তাহারই সাহায্যে আমরা শূন্যে উত্থিত হইব। বিভিন্ন ওজনের বস্তু উত্তোলনের নিমিত্ত ছোট বড় বিবিধ ওজনের হাইড্রোজেন গোলা ব্যবহৃত হয়। এখন বুঝিলাম, এই জন্য আমার ওজন অবগত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। অতঃপর এই অপরূপ বায়ুযানে দুইটী পাখার মত ফলা সংযুক্ত হইল, শুনিলাম ইহা বিদ্যুৎ দ্বারা পরিচালিত হয়। আমরা উভয়ে আসনে উপবেশন করিলে পর তিনি ঐ পাখার কল টিপিলেন। প্রথমে আমাদের 'তখ্‌তে রওয়াঁ' খানি * ধীরে ধীরে ৭।৮ হাত উর্দ্ধে উত্থিত হইল, তার পর বায়ুভরে উড়িয়া চলিল! আমি ভাবিলাম, এমন জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নত দেশের অধীশ্বরীকে দেখিতে যাইতেছি, যদি আমার কথাবার্ত্তায় তিনি আমাকে নিতান্ত মূর্খ ভাবেন—এবং সেই সঙ্গে আমাদের সাধের হিন্দুস্থানকে 'মূর্খস্থান' মনে করেন? কিন্তু অধিক ভাবিবার সময় ছিল না,—সবে তখ্‌তে রওয়াঁ শূন্যে উড়িতে আরম্ভ করিয়াছে আর অমনই দেখি, আমরা চপলা-গতিতে রাজধানীতে উপনীত! সেই বায়ুযানে বসিয়াই দেখিতে পাইলাম, সখী-সহচরী-পরিবেষ্টিতা মহারাণী তাঁহার চারি বৎসরবয়স্কা কন্যার হাত ধরিয়া উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন। সমস্ত রাজধানী যেন একটি বিরাট কুসুমকুঞ্জ বিশেষ! তাহার সৌন্দর্য্যের তুলনা এ জগতে নাই!

মহারাণী দূর হইতে ভগিনী সারাকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন, "বাঃ! আপনি এখানে!" ভগিনী সারা রাণীকে অভিবাদন করিয়া ধীরে ধীরে তখ্‌তে রওয়াঁ অবনত করিলে আমরা অবতরণ করিলাম।

আমি যথাবিধি মহারাণীর সহিত পরিচিতা হইলাম। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হইলাম। আমার যে আশঙ্কা ছিল, তিনি আমাকে কি যেন মনে করিবেন, এখন সে ভয় দূর হইল। তাঁহার সহিত রাজনীতি সম্বন্ধে বিবিধ প্রসঙ্গ হইল। বাণিজ্য-ব্যবসায় সম্বন্ধেও কথা উঠিয়াছিল। তিনি বলিলেন, যে অবাধ বাণিজ্যে তাঁহার আপত্তি নাই; "কিন্তু যে সকল দেশে রমণীবৃন্দ অন্তঃপুরে থাকে অথবা যে সব দেশে নারী কেবল বিবিধ বসন ভূষণে সজ্জিতা হইয়া পুত্তলিকাবৎ জীবন বহন করে,—দেশের কোন কাজ করে না, তাহারা বাণিজ্যের নিমিত্ত নারীস্থানে আসিতে বা আমাদের সহিত কাজ কর্ম্ম করিতে অক্ষম। এই কারণে অন্য দেশের সহিত আমাদের বাণিজ্য-ব্যবসায় চলিতে পারে না। পুরুষেরা নৈতিক জীবনে অনেকটা হীন বলিয়া আমরা তাহাদের সহিত কোন প্রকার কারবার করিতে ইচ্ছুক নহি। আমরা অপরের জমী-জমার প্রতি লোভ করিয়া দুই দশ বিঘা ভূমির জন্য রক্তপাত করি না; অথবা এক খণ্ড হীরকের জন্যও যুদ্ধ করি না,—যদ্যপি তাহা কোহেনূর অপেক্ষা শত গুণ শ্রেষ্ঠ হয়; কিম্বা কাহারও ময়ূর-সিংহাসন দর্শনেও হিংসা করি না। আমরা অতল জ্ঞানসাগরে ডুবিয়া রত্ন আহরণ করি। প্রকৃতি মানবের জন্য তাহার অক্ষয় ভাণ্ডারে যে অমূল্য রত্নরাজি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে, আমরা তাহাই ভোগ করি। তাহাতেই আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিই।

মহারাণীর নিকট বিদায় লইয়া আমি সেই সুপ্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় দেখিতে গেলাম, এবং কতিপয় কলকারখানা, রসায়নাগার এবং মানমন্দিরও দেখিলাম।

উপরোক্ত দ্রষ্টব্য স্থান সমূহ পরিদর্শনের পর আমরা পুনরায় সেই বায়ুযানে আরোহণ করিলাম। কিন্তু যেই আমাদের তখ্‌তে রওয়াঁ খানি ঈষৎ হেলিয়া উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, আমি কি জানি কিরূপে আসনচ্যুত হইলাম,—সেই পতনে আমি চমকিয়া উঠিলাম। চক্ষু খুলিয়া দেখি, আমি তখনও সেই আরাম কেদারায় উপবিষ্টা!

মতীচুর-রচয়িত্রী।

---

* ইংরাজীতে 'travelling throne' বলা যাইতে পারে।

শ্রীমতী সরোজিনা নাইডু।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু।

সে দিন কলিকাতায় ভারতীয় সমাজ-সংস্কার-সমিতির অধিবেশন দিনে একটী বঙ্গমহিলার অদ্ভুত তেজস্বিতা ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণে সমবেত জনমণ্ডলী মুগ্ধ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। এই প্রতিভাশালিনী মহিলার নাম শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু। ধারান্তরে আমাদের পাঠক পাঠিকাগণকে আমরা এই বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ উপহার দিব, অদ্য তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী ও প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইতেছে।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী দাক্ষিণাত্যে নিজাম রাজ্যের রাজধানী হাইদরাবাদে শ্রীমতী সরোজিনী জন্ম-গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, ইনি পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করতঃ উচ্চ উপাধিতে ভূষিত হইয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিজাম রাজ্যে আগমন করেন। ইনিই নিজামের কলেজের স্থাপয়িতা, বর্ত্তমান সময়ে ইনি নিজাম রাজ্যের শিক্ষাবিভাগে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আছেন।

শ্রীমতী সরোজিনী এই চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ সন্তান। শৈশবেই তিনি ইংরেজীতে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যশিক্ষা সম্বন্ধে সরোজিনী নিজে লিখিয়াছেন,—"শৈশবেই অত্যন্ত কল্পনাপ্রিয় হইলেও সে সময় কবিতা লিখিবার জন্য আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। আমার পিতার দৃঢ় সংকল্প ছিল, গণিত ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে আমাকে সুপণ্ডিতা করিবেন। এই ভাবেই তিনি আমাকে শিক্ষা দিতেছিলেন, কিন্তু পিতা ও মাতার (তরুণ বয়সে আমার মা কয়েকটী সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছিলেন) নিকট হইতে যে কবিতানুরাগের উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলাম, তাহাই বিজ্ঞান শিক্ষার চেষ্টার উপর প্রাধান্য লাভ করিল। আমার এগার বৎসর বয়সের সময় এক দিন বীজ-গণিতের (Algebra) একটা আঁক কসিতে না পারিয়া বিমর্ষভাবে ভাবিতেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই আঁকটা শুদ্ধ করিয়া কসিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু সে সময় হঠাৎ একটা কবিতা মনে আসিল, আমি তাহা লিখিলাম। সেই দিন হইতেই কবি-জীবনের সূত্রপাত। তের বৎসর বয়সে ছয় দিনে তের শত পংক্তির একখানা কবিতা-পুস্তক লিখিলাম। সেই বৎসরেই অসুখের সময়ে এক দিন ডাক্তার বলিলেন, আমার অত্যন্ত অসুখ করিয়াছে, বই ছুঁইতে পাইব না। তাঁহার কথার প্রতি অনাস্থা প্রকাশের জন্য তখনি এক খানা নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম এবং দুই সহস্র পংক্তিতে তাহা সম্পূর্ণ করিলাম। এই সময়ই চিরকালের তরে আমার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইল, বিদ্যালয়ে পাঠ বন্ধ হইল, কিন্তু বাড়ীতে আমি খুব পড়িতে লাগিলাম। চৌদ্দ হইতে ষোল বৎসরের মধ্যেই আমি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পড়িয়াছি। এই সময় আমি এক খানা উপন্যাস লিখিয়াছিলাম, অন্যান্য লেখাও অনেক লিখিয়াছিলাম। এই সময় আমি জীবনের গুরুত্ব বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়াছিলাম।"

বার বৎসর বয়সে সরোজিনী এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং দেশময় তাঁহার প্রশংসা রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। ইহার কিছুকাল পরে তিনি মান্দ্রাজী শূদ্রজাতীয় শ্রীযুক্ত গোবিন্দরাজলু নাইডুকে বিবাহ করিতে অভি-লাষিণী হন, কিন্তু তাঁহার পিতামাতা কন্যার এই মনোরথ সমর্থন করিতে পারেন নাই। জাতিভেদই তাঁহাদের অসম্মতির কারণ। সরোজিনীর হৃদয়ে ইহাতে দারুণ আঘাত লাগে। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ষোল বৎসর বয়সে নিজাম প্রদত্ত বৃত্তি গ্রহণ করিয়া ইঁহার পিতা ইঁহাকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। কন্যার অভীপ্সিত বিবাহে বাধা প্রদানই বোধ হয় তাঁহাকে ইংলণ্ড প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল। তিন বৎসর কাল তিনি সেখানে বিদ্যা শিক্ষা করেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে কিছু দিনের জন্য তিনি একবার ইটালীতে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। সেই বৎসরই ডিসেম্বর মাসে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি তাঁহার প্রেমাস্পদ গোবিন্দরাজলু নাইডু মহাশয়কে বিবাহ করেন। সরোজিনী এখন চারি সন্তানের জননী। পতি ও পুত্র কন্যার প্রেমে তিনি এখন পরম সৌভাগ্যবতী রমণী, স্বদেশ বিদেশে তাঁহার প্রতিভার সুযশ বিস্তৃত।

বাল্যাবধি সরোজিনী ইংরেজী ভাষাতেই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার কবিতাও ইংরেজী ভাষাতেই রচিত। ইংলণ্ড ও এদেশের অনেক ইংরেজী মাসিক পত্রে তাঁহার কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকৃত কবিত্ব শক্তির জন্য তাঁহার কবিতা অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী। সভ্য জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৈনিক পত্র ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত "টাইমস্" পর্য্যন্ত তাঁহার কবিতা পুস্তক "গোল্ডেন থ্রেসওল্ডের" (Golden Threshold) ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। অন্যান্য শত শত পত্রের ত কথাই নাই। কুমারী তরুদত্তের পর ইংরাজী সাহিত্যক্ষেত্রে আর কোন ভারতবাসী পুরুষ বা নারী এরূপ উচ্চ সম্মান লাভ করেন নাই। জাতীয় সমাজ-সংস্কার-সমিতির অধিবেশন-সভা ব্যতীত ভারত-মহিলা পরিষদের অধিবেশনে ও কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে তিনি দুইটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার বাগ্মিতা শক্তির প্রশংসা সহরের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ায় শেষোক্ত দিন ব্রহ্মমন্দিরে লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল, বহু লোক স্থানাভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও "ষ্টেটস্‌ম্যান" পত্রের সুপণ্ডিত সম্পাদক সেই দিনের বক্তৃতাটীর প্রচুর প্রশংসা করেন। শ্রীমতী নাইডু মহাশয়া বাংলা লিখিতে পারেন না, অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইংরেজীতে "ভারত-মহিলার" জন্য প্রবন্ধ লিখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, আমরা তাহা বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিব।

স্ত্রীশিক্ষা।*

বর্ত্তমান সময়ে আমরা দেশের সর্ব্বত্র জাতীয় জীবনের সূচনা দেখিতেছি। তামসী রজনী শেষে প্রকৃতির মুখে কোন কোন লক্ষণের প্রকাশ দেখিয়া আমরা যেমন বুঝিতে পারি, যে পূর্ব্বাকাশে ঊষার আলোক প্রকটিত হইবার অধিক বিলম্ব নাই, সেইরূপ আমাদের চিত্তে কোন কোন আকাঙ্ক্ষার স্ফুরণ দেখিয়া মনে আশা হইতেছে, যে জাতীয় জাগরণের সময় নিকটবর্ত্তী।

এত দিন জাতীয় চিন্তা প্রধানতঃ রাজনৈতিক স্বত্ব লাভের চেষ্টায় নিযুক্ত ছিল; কিন্তু এই দুরন্ত প্রয়াসে বহু স্থলে ব্যর্থমনোরথ হইয়া এখন অনেকের নিকট এই সত্য উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইতেছে, যে গার্হস্থ্য ও সামাজিক সংস্কার ভিন্ন রাজনৈতিক স্বত্ব লাভের চেষ্টা বৃথা; কারণ জাতীয় চরিত্র সবল ও কর্ম্মঠ এবং গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবন নীতির উন্নততর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে সে সকল অধিকার অনেক স্থলেই রামচন্দ্র-প্রদত্ত লক্ষ্মণের ফলের মত বৃথা শুষ্ক হইয়া যাইবে। শত শত বৎসরের পুঞ্জীভূত যে সকল কুসংস্কার ও অন্ধ ধর্ম্মবিশ্বাসের কুটিল নাগ-পাশ গলে দিয়া জাতীয় জীবন মুমূর্ষু দশাগ্রস্ত হইয়াছে, সে করাল বন্ধন কোন্ শাণিত অস্ত্রের আঘাতে ছিন্ন হইবে? আমি বলি, তাহা নারীশক্তি। পুরুষেরা নারীদের যতই অবজ্ঞা করুন না কেন, তাঁহাদের—এবং কেবল তাঁহাদের কেন,—সমগ্র জনসমাজের ভদ্রাভদ্র বহুল পরিমাণে নারীর হস্তে। বাল্য হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত পুরুষ অজ্ঞাতসারে এই প্রভাবের অধীন। নারী যদি পার্শ্বে থাকিয়া পুরুষের মহত্ত্ব লাভের সহায় হন, তাহাতে তাঁহাকে যেমন উন্নত করিতে পারে, এমন আর কিছুতেই পারে না। পুরুষকে উন্নত বা অবনত করা প্রধানতঃ নারীরই হস্তে। লেডী ম্যাকবেথ শ্রেণীর নারী পুরুষকে যেমন দুষ্কৃতির অন্ধতম নরকে নিক্ষেপ করিতে পারেন, গান্ধারী ও দ্রৌপদীর ন্যায় রমণীরা তদ্রূপ দুরাচারের কবল হইতে বিপুল কুল উদ্ধার করিয়া তাহাকে পুনরায় পুণ্যের পথে পরিচালিত করিতে পারেন।

কিন্তু আপনার এই নিগূঢ় শক্তি বুঝিতে ও যথাস্থলে তাহার সম্যক্ প্রয়োগ করিতে রমণীর উপযুক্ত শিক্ষা আবশ্যক। স্ত্রীশিক্ষা অর্থে সাধারণতঃ যাহা বুঝায়, আমি তাহা বলিতেছিনা। আমি শিক্ষা অর্থে হৃদয়-মনের সকল শক্তির সম্যক্ পুষ্টি সাধন ও পূর্ণ বিকাশ বলিতেছি। ঈশ্বর প্রদত্ত নারীর বিপুল শক্তিকে জীবনের মহৎ আদর্শের সমক্ষে আনিয়া সুগঠিত ও কর্ম্মশীল করিয়া তুলিতে হইবে, ইহাই আমাদের জাতীয় কর্ত্তব্য।

অনেক স্থলে রমণীর উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে নানাপ্রকার

* জাতীয় মহা সমিতির সামাজিক অধিবেশনে পঠিত।

ভ্রান্তিমূলক দুর্ব্বল ধারণা আছে। অনেকের বিশ্বাস, স্ত্রীলোক শিক্ষায় পুরুষের সমকক্ষ হইলে সমাজ মধ্যে ঘোর বিপ্লব ও গৃহ মধ্যে মহা অনর্থের উৎপত্তি হইবে। প্রথিতনামা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সুবর্ণগোলক নামক রহস্য প্রবন্ধে যে চিত্র প্রকটিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে তখন তাহাই হইবে অর্থাৎ পুরুষ নারী সাজিয়া গৃহকর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিবেন এবং নারী পুরুষের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কেবল বাহিরে বাহিরে সভা সমিতি করিয়া বেড়াইবেন এবং গৃহ জীর্ণ অরণ্যে পরিণত হইবে। তাঁহাদের মতে সামান্য লিখন পঠন গার্হস্থ্য আয়ব্যয়ের হিসাব রক্ষণ, সন্তান-পালন, রীতি শিক্ষা ও সঙ্গীত চর্চ্চা ইহাই নারীর শিক্ষার চরম সীমা, ইহার অধিক দূর অগ্রসর হইলেই নারীর প্রকৃতি-বিকৃতি ঘটিবার আশঙ্কা। কিন্তু আমরা এই আতঙ্কের কোন হেতু দেখিতে পাই না। কে কবে শুনিয়াছেন, যে পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের উচ্চতম শিক্ষা লাভ করিয়া পুরুষ ধন অর্জ্জন, পরিবার প্রতিপালন প্রভৃতি গৃহীর কর্ত্তব্য সাধনে অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছেন? যে মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন লাভ পুরুষের পক্ষে উন্নত মানব জন্মের চিরস্পৃহনীয় সফলতা, তাহা পাইয়া নারী তৃপ্ত ও উন্নত না হইয়া হেয় ও অধোগতি প্রাপ্ত হইবেন, এ কেমন কথা? যাহা বিমল আলোক দান করিয়া এক জনকে মানবত্বের গৌরব-শিখরে উত্থিত করে, তাহা অপরকে কেন চির অন্ধতম প্রদেশে লইয়া যাইবে? মন, বিবেক ও আত্মার সকল শক্তির সম্যক্ বিকাশে যদি পুরুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পৌরুষ, তবে তাহা দ্বারা নারীর পূর্ণতা লাভ কেন না হইবে? অচ্ছোদের তীরে বৈধব্যধারিণী তরুণী কুমারী তাপসীর একাগ্র তপস্যার বর্ণনা বা কণ্বের তপোবন হইতে শকুন্তলার দুষ্যন্ত গৃহে যাত্রা অথবা উত্তর-চরিতের চিত্রদর্শন অঙ্কের হৃদয়মুগ্ধকর আলেখ্যে মানব কবিত্বের চরম উৎকর্ষ দেখিয়া পুরুষের হৃদয় যদি সম্ভ্রম ও বিস্ময়ভরে আপ্লুত হইয়া উন্নত হয়, তবে তাহার অধ্যয়ন ও স্বাদ গ্রহণ করিয়া কেবল রমণীই কি তাঁহার কমনীয় জীবন হইতে স্খলিত হইয়া পড়িবেন? আদিম বাইবেল গ্রন্থের সেই পৌরাণিকী কথার ন্যায় জ্ঞান বৃক্ষের উপাদেয় ফল কি কেবল নারীর পক্ষেই নিষিদ্ধ ও মারাত্মক হইল? ভারত-বন্ধু বিখ্যাত ফসেটের কন্যা কেম্ব্রিজের সর্ব্বোচ্চ গণিত পরীক্ষায় উচ্চতম পরীক্ষার্থীরও ঊর্দ্ধে স্থান লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা এমন সংবাদ পাই নাই, যে উচ্চ অঙ্গের গণিত-শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা তিনি নারীর প্রকৃতিসুলভ কোমলতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। ফরাসী বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক কুরী যে রেডিয়াম আবিষ্কার দ্বারা জগতে বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর সম্মিলিত গবেষণার ফল। ইহার মধ্যে কাহার কৃতিত্ব অধিক তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। তাঁহারা উভয়ে একত্রে নোবল উপহার দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। কুরীর শোচনীয় মৃত্যুর পর মাডাম কুরী সর্ব্বসম্মতিক্রমে পতির পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। সমগ্র জীবন বিজ্ঞানের অনুশীলনে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি বধূ, পত্নী ও মাতার কর্ত্তব্য পালনে অশক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এমন কথা কেহ বলিতে পারেন না। মুক্তিফৌজের অধিনায়ক জেনারেল বুথের সহধর্ম্মিণী জীবনের মহাব্রত সাধনে চিরদিন পতির সহযোগিনী ছিলেন। তাঁহাকে অধিকাংশ সময় বাহিরে বাহিরে সভা সমিতি ও বক্তৃতাদি করিতে হইত, কিন্তু তাহা বলিয়া জেনারেল বুথ এমন আক্ষেপ কখনও করেন নাই, যে Mrs. Booth নারীর সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য যে পতিসেবা ও সন্তান পালন, তাহাতে অবহেলা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য প্রদেশে এমন ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে, যাহাতে রমণী তাঁহার সর্ব্ব প্রথম পবিত্র কর্ত্তব্য সমাধা করিয়াও স্বীয় স্বীয় রুচি, শক্তি ও সুবিধা অনুসারে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, সঙ্গীত, কলা বিদ্যার আলোচনা অথবা মানবসেবায় শক্তি নিয়োগ করিয়া জীবনের সফলতা ও চিত্তের নির্ম্মল আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন। কন্যা, ভগিনী, বধূ, পত্নী ও মাতার কর্ত্তব্য গৌরবভরে সম্পাদন করা নারীর শ্রেষ্ঠ অধিকার। মানসিক ও নৈতিক শক্তি বিকশিত হইলে কি এই প্রীতিপূর্ণ ও অনুপম সুখময় কার্য্য করিবার যোগ্যতা অধিক বর্দ্ধিত

হয় না?* বস্তুতঃ পাশ্চাত্য নারীগণ তাঁহাদের অন্তর-নিহিত শক্তির চালনা দ্বারা জনসমাজে যে প্রভাব উৎপন্ন করিতেছেন, তাহা অতীব বিস্ময়জনক। স্বাধীনভাবে আত্মশক্তির পরিচালনা করিবার সুবিধা পাইলে এই সমস্ত উন্নতিশীল মানবজাতি জগতে যে কত কার্য্য করিতে পারেন, শত শত বৎসরের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরাধীনতা এবং চিন্তার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বাস করিয়া আমরা তাহা ভুলিয়া গিয়াছি, সেইজন্য গৃহ ও সমাজ মধ্যে কোথাও স্বাধীনতার প্রসার দেখিলে আমরা ত্রাসে অধীর হইয়া উঠি। কিন্তু যে ত্রিধারা বিষ্ণুপদ হইতে উদ্গত হইয়া পৃথিবীকে উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী করিতে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাকে আবদ্ধ করিতে গেলে তাহা যেমন সর্ব্ব স্থলে রোগ ও মৃত্যুর বিষ বিস্তার করে, সেইরূপ নারীর যে শক্তি সমাজে প্রসার লাভ করিলে তন্মধ্যে বহুপ্রকার কল্যাণ আনয়ন করিতে পারিত, তাহা রুদ্ধ হইয়া গিয়া তৎপরিবর্ত্তে যে ক্ষুদ্রাশয়তা ও স্বার্থান্ধতার পূতিগন্ধ বিস্তার করিতেছে, তাহার ফলে কেবল নারীজাতি নয়, কিন্তু পুরুষেরাও মনের দৃঢ়তা ও মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কঠোর ত্যাগের উন্নত শক্তি হারাইয়া ফেলিতেছেন। কত উদ্যম ও শক্তিশালী যুবকের মনের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা মাতা বা পত্নীর প্রতিকূল আচরণে যে বাষ্পের মত বিলীন হইয়া যাইতেছে, সে শোচনীয় কাহিনী আমরা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে জানি। পুরুষের প্রাণে যে মহৎ আকাঙ্ক্ষা ও ধর্ম্মভাব আছে, তাহার সহিত নারীর প্রকৃতি মিলিত হইলে যে কত সুফল উৎপন্ন হয়, সুশিক্ষিতা, উন্নতচেতা ও পবিত্রহৃদয়া নারীর বিমল সঙ্গ পাইলে পুরুষের হৃদয় যে কত ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, সমাজের দুর্ভাগ্যবশতঃ এখনও তাহা কেহ বুঝিতে পারিতেছেন না।

বহু যোজন বিস্তীর্ণ শুষ্ক মরুভূমির মধ্যে শীতল উৎসে সুসিক্ত ও সুচ্ছায় ভূমি খণ্ডের মত এক এক জন গার্গী ও মৈত্রেয়ীর অবিনশ্বর নাম ভারত-নারীকে জ্ঞানের পথ দেখাইতে কি আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান নাই? যে নারী বিপুল সভামধ্যে অকুণ্ঠিত মহিমাভরে দণ্ডায়মান হইয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং বিষয় বিভাগ করিতে প্রবৃত্ত পতি যাজ্ঞবল্ক্যকে যে রমণী বিষাদ-ম্লান কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হে ভগবান্, যদি বিত্তপূর্ণ এই মহী আমার হয়, তবে কি আমি তদ্দ্বারা অমরত্ব লাভ করিতে পারি?" এবং বিত্ত দ্বারা অমরত্ব লাভের সম্ভাবনা নাই জানিয়া যাঁহার মুখ হইতে এই অপূর্ব্ব বাণী নির্গত হইয়াছিল, "যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্"—যাহা দ্বারা আমি অমর না হই তাহা লইয়া তবে আমি কি করিব? ইঁহাদের অমর আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত সমুন্নত জীবন কি ভারত-নারীর কর্ণে কোন শুভ বার্ত্তা বহন করিতেছে না? সে আহ্বান শুনিয়া জাতীয় অভ্যুত্থানের মাহেন্দ্র মুহূর্ত্তে আমরা ভারত-নারী কি ত্বরান্বিত হইয়া উঠিব না? "নাল্পে সুখমস্তি" অল্পে সুখ নাই। ভারত-নারী আর অল্প লইয়া সুখী ও তৃপ্ত থাকিতে পারিতেছে না। আমাদের আকাঙ্ক্ষা বৃহৎ, এবং তাহা ঐ ঋষি-রমণীগণের জীবনের ছবিতেই সিদ্ধি অন্বেষণ করিবে, অপর কিছুতে নহে।

শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা বসু।

---

* সুবিখ্যাত জেমস্ মার্টিনো এক স্থানে লিখিয়াছেন, A soul occupied with great ideas best performs small duties.

স্মরণীয় দিন।

১

যত দিন ছিলে না'ক, ধরণী আমার
ছিল শুধু অপদার্থ ভরা,
মরমে ছিল না বল, নয়নে ছিল না জল,
সমস্ত জগত ছিল হাহাকার করা।

২

তখন পরের ব্যথা জাগেনি পরাণে,
বুঝিনি সহানুভূতি-জালা,
আপনি আপন মনে, ফিরিতাম বনে বনে,
হাসিয়া ফেলেছি ছিঁড়ি সোহাগের মালা।